শ্রীঅরবিন্দ

কারাকাহিনী

শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম
পণ্ডিচেরী

শ্রীঅরবিন্দ

কারাকাহিনী

শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম
পণ্ডিচেরী

Kara Kahini — Sri Aurobindo
প্রথম মুদ্রণ "সুপ্রভাত" ১৯০৯

ষষ্ঠ সংস্করণ ১৯৮১
পুনর্মুদ্রণ ১৯৮৫

শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম প্রকাশন বিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত
মুদ্রক – শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম প্রেস, পণ্ডিচেরী

বিজ্ঞাপন।

কারাকাহিনী ১৩১৬ সালের 'সুপ্রভাতে' প্রতিমাসে প্রকাশিত হইতেছিল। সেই সময়ে হঠাৎ তিনি বাংলা দেশ ছাড়িয়া যাওয়ায় তাঁহার অন্যান্য ধারাবাহিক প্রবন্ধ সম্বন্ধে যাহা হইয়াছিল এখানিরও সেই অবস্থা হয় অর্থাৎ সম্পূর্ণ হয় নাই। এক্ষণে ঐ অসম্পূর্ণ প্রবন্ধ পুস্তকাকারে প্রকাশ করা হইল এই হিসাবে যে উপস্থিত সম্পূর্ণ করা হইলে যে বই বাহির হইতেছিল তাহা আর হইবে না -- সম্পূর্ণ নূতন হইবে; দ্বিতীয়, সে সময়ের অধিকাংশ কথাই তাঁহার আর তেমন মনে নাই। কারাগৃহ ও স্বাধীনতা 'ভারতী'তে বাহির হইয়াছিল।
ইতি --

২০ শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৮ প্রকাশক
৪১নং রু ফ্রাঁসোয়া মার্ত্তা
পণ্ডিচেরী।

ষষ্ঠ সংস্করণের বিজ্ঞাপন

'কারাকাহিনী'র বর্তমান সংস্করণটি আমূল পরিশোধিত আকারে প্রকাশ করা হইল। ১৩১৬ সালের 'সুপ্রভাত' পত্রিকায় ধারাবাহিক ক্রমে প্রকাশিত এই রচনার সঙ্গে পূর্বের সংস্করণগুলি মিলাইয়া মূল লেখাটি অপরিবর্তিত আকারে এখানে উপস্থাপিত করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। পূর্ব সংস্করণগুলিতে বাদ পড়া কিছু কিছু অংশ এখানে পুনরায় সংযুক্ত করা হইয়াছে, যেগুলি যথেষ্ট আগ্রহের সঞ্চার করিবে বলিয়া সম্পাদকেরা আশা করেন।

১লা আশ্বিন ১৩৮৮ প্রকাশক
শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম
পণ্ডিচেরী।

কারাকাহিনী

১৯০৮ সনের শুক্রবার ১লা মে আমি "বন্দেমাতরম্" আফিসে বসিয়াছিলাম, তখন শ্রীযুক্ত শ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তী আমার হাতে মজঃফরপুরের একটি টেলিগ্রাম দিলেন। পড়িয়া দেখিলাম মজঃফরপুরে বোমা ফাটিয়াছে, দুটি য়ুরোপীয়ান স্ত্রীলোক হত। সেদিনের "এম্পায়ার" কাগজে আরও পড়িলাম, পুলিস কমিশনার বলিয়াছেন আমরা জানি কে কে এই হত্যাকাণ্ডে লিপ্ত এবং তাহারা শীঘ্র গ্রেপ্তার হইবে। জানিতাম না তখন যে আমি এই সন্দেহের মুখ্য লক্ষ্যস্থল, আমিই পুলিসের বিবেচনায় প্রধান হত্যাকারী, রাষ্ট্রবিপ্লবপ্রয়াসী যুবকদলের মন্ত্রদাতা ও গুপ্ত নেতা। জানিতাম না যে এই দিনই আমার জীবনের একটা অঙ্কের শেষ পাতা, আমার সম্মুখে এক বৎসরের কারাবাস, এই সময়ের জন্য মানুষের জীবনের সঙ্গে যতই বন্ধন ছিল, সবই ছিন্ন হইবে, এক বৎসর কাল মানবসমাজের বাহিরে পিঞ্জরাবদ্ধ পশুর মত থাকিতে হইবে। আবার যখন কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিব, তথায় সেই পুরাতন পরিচিত অরবিন্দ ঘোষ প্রবেশ করিবে না, কিন্তু একটি নূতন মানুষ, নূতন চরিত্র, নূতন বুদ্ধি, নূতন প্রাণ, নূতন মন লইয়া নূতন কর্ম্মভার গ্রহণ করিয়া আলিপুরস্থ আশ্রম হইতে বাহির হইবে। বলিয়াছি এক বৎসর কারাবাস, বলা উচিত ছিল এক বৎসর বনবাস, এক বৎসর আশ্রমবাস। অনেক দিন হৃদয়স্থ নারায়ণের সাক্ষাৎ দর্শনের জন্য প্রবল চেষ্টা করিয়াছিলাম; উৎকট আশা পোষণ করিয়াছিলাম জগদ্ধাতা পুরুষোত্তমকে বন্ধুভাবে, প্রভুভাবে লাভ করি। কিন্তু সহস্র সাংসারিক বাসনার টান, নানা কর্ম্মে আসক্তি, অজ্ঞানের প্রগাঢ় অন্ধকারে তাহা পারি নাই। শেষে পরম দয়ালু সর্ব্বমঙ্গলময় শ্রীহরি সেই সকল শত্রুকে এক কোপে নিহত করিয়া তাহার সুবিধা করিলেন, যোগাশ্রম দেখাইলেন, স্বয়ং গুরুরূপে, সখারূপে সেই ক্ষুদ্র সাধন কুটীরে অবস্থান করিলেন। সেই আশ্রম ইংরাজের কারাগার। আমার জীবনে এই আশ্চর্য্য বৈপরীত্য বরাবর দেখিয়া আসিতেছি যে আমার হিতৈষী বন্ধুগণ আমার যতই না উপকার করুন, অনিষ্টকারীগণ--শত্রু কাহাকে বলিব, শত্রু আমার আর নাই--শত্রুই অধিক উপকার করিয়াছেন। তাঁহারা অনিষ্ট করিতে গেলেন, ইষ্টই হইল। বৃটিশ গবর্ণমেন্টের কোপ-দৃষ্টির একমাত্র ফল, আমি ভগবানকে পাইলাম। কারাগৃহবাসে আন্তরিক জীবনের ইতিহাস লিপিবদ্ধ করা এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নয়, কয়েকটি বাহ্যিক ঘটনা মাত্র বর্ণনা করিতে ইচ্ছা করি, কিন্তু যাহা কারাবাসের মুখ্য ভাব তাহা প্রবন্ধের প্রারম্ভে একবার উল্লেখ করা ভাল বিবেচনা করিলাম। নতুবা পাঠকগণ মনে করিবেন যে, কষ্টই কারাবাসের সার। কষ্ট যে ছিল না তাহা বলা যায় না, কিন্তু অধিকাংশকাল আনন্দেই কাটিয়া গিয়াছে।

শুক্রবার রাত্রিতে আমি নিশ্চিন্ত মনে ঘুমাইয়াছিলাম, ভোরে প্রায় ৫ টার সময় আমার ভগিনী সন্ত্রস্ত হইয়া ঘরে ঢুকিয়া আমাকে নাম ধরিয়া ডাকিল,

জাগিয়া উঠিলাম। পরমুহূর্ত্তে ক্ষুদ্র ঘরটি সশস্ত্র পুলিসে ভরিয়া উঠিল; সুপারিন্টেণ্ডেন্ট ক্রেগান, ২৪ পরগণার ক্লার্ক সাহেব, সুপরিচিত শ্রীমান বিনোদ-কুমার গুপ্তের লাবণ্যময় ও আনন্দদায়ক মূর্ত্তি, আর কয়েকজন ইন্‌স্পেক্‌টার, লাল পাগড়ি, গোয়েন্দা, খানাতল্লাসীর সাক্ষী। হাতে পিস্তল লইয়া তাহারা বীরদর্পে দৌড়াইয়া আসিল, যেন বন্দুক-কামানসহ একটি সুরক্ষিত কেল্লা দখল করিতে আসিল। শুনিলাম, একটি শ্বেতাঙ্গ বীরপুরুষ আমার ভগিনীর বুকের উপর পিস্তল ধরে, তাহা স্বচক্ষে দেখি নাই। বিছানায় বসিয়া আছি, তখনও অর্দ্ধনিদ্রিত অবস্থা, ক্রেগান জিজ্ঞাসা করিলেন, "অরবিন্দ ঘোষ কে, আপনিই কি?" আমি বলিলাম, "আমিই অরবিন্দ ঘোষ"। অমনি একজন পুলিসকে আমাকে গ্রেপ্তার করিতে বলেন। তাহার পর ক্রেগানের একটি অতিশয় অভদ্র কথায় দুজনের অল্পক্ষণ বাক্‌বিতণ্ডা হইল। আমি খানাতল্লা-সীর ওয়ারেন্ট চাহিলাম, পড়িয়া তাহাতে সহি করিলাম। ওয়ারেন্টে বোমার কথা দেখিয়া বুঝিলাম, এই পুলিস সৈন্যের আবির্ভাব মজঃফরপুরের খুনের সহিত সংশ্লিষ্ট। কেবল বুঝিলাম না আমার বাড়ীতে বোমা বা অন্য কোন স্ফোটক পদার্থ পাইবার আগেই --এর অভাবে কেন আমাকে গ্রেপ্তার করে। তবে সেই সম্বন্ধে বৃথা আপত্তি করিলাম না। তাহার পরেই ক্রেগানের হুকুমে আমার হাতে হাতকড়ি, কোমরে দড়ি দেওয়া হইল। একজন হিন্দুস্থানী কনষ্টেবল সেই দড়ি ধরিয়া পিছনে দাঁড়াইয়া রহিল। সেই সময়েই শ্রীযুক্ত অবিনাশ ভট্টাচার্য্য ও শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্র বসুকে পুলিস উপরে আনে, তাহাদেরও হাতে হাতকড়ি, কোমরে দড়ি। প্রায় আধ ঘন্টার পর কাহার কথায় জানি না, তাহারা হাতকড়ি ও দড়ি খুলিয়া লয়। ক্রেগানের কথার ভাবে প্রকাশ পাইল যে, তিনি যেন হিংস্র পশুর গর্ত্তে ঢুকিয়াছেন, যেন আমরা অশিক্ষিত হিংস্র স্বভাববিশিষ্ট আইনভঙ্গকারী, আমাদের প্রতি ভদ্র ব্যবহার করা বা ভদ্র কথা বলা নিষ্প্রয়োজন। তবে ঝগড়ার পর সাহেব একটু নরম হইয়া পড়িলেন। বিনোদ বাবু তাঁহাকে আমার সম্বন্ধে কি বুঝাইতে চেষ্টা করেন। তাহার পর ক্রেগান আমাকে জিজ্ঞাসা করেন, "আপনি নাকি বি-এ পাশ করিয়াছেন? এইরূপ বাসায় এমন সজ্জাবিহীন কামরায় মাটিতে শুইয়াছিলেন, এই অবস্থায় থাকা কি আপনার মত শিক্ষিত লোকের পক্ষে লজ্জাজনক নহে?" আমি বলিলাম, "আমি দরিদ্র, দরিদ্রের মতই থাকি।" সাহেব অমনি সজোরে উত্তর করিলেন, "তবে কি আপনি ধনী লোক হইবেন বলিয়া এই সকল কাণ্ড ঘটাইয়াছেন?" দেশহিতৈষিতা, স্বার্থত্যাগ বা দারিদ্র্য-ব্রতের মাহাত্ম্য এই স্থূলবুদ্ধি ইংরাজকে বোঝান দুঃসাধ্য বিবেচনা করিয়া আমি সে চেষ্টা করিলাম না।

এতক্ষণ খানাতল্লাসী চলিতেছে। ইহা সাড়ে পাঁচটার সময় আরম্ভ হয় এবং প্রায় সাড়ে এগারটায় শেষ হয়। বাক্‌সের ভিতর বা বাহিরে যত খাতা, চিঠি, কাগজ, কাগজের টুকরা, কবিতা, নাটক, পদ্য, গদ্য, প্রবন্ধ, অনুবাদ যাহা

পাওয়া যায়, কিছুই এই সর্ব্বগ্রাসী খানাতল্লাসীর কবল হইতে মুক্তি পায় না। খানাতল্লাসীর সাক্ষীদের মধ্যে রক্ষিত মহাশয় যেন একটু মনঃক্ষুণ্ন; পরে অনেক বিলাপ করিয়া তিনি আমাকে জানাইলেন, পুলিস তাঁহাকে কিছু না বলিয়া হঠাৎ ধরিয়া লইয়া আসে, তিনি আদবে খবর পান নাই যে, তাঁহাকে এমন ঘৃণিত কার্য্যে যোগদান করিতে হইবে। রক্ষিত মহাশয় অতি করুণ ভাবে এই হরণকাণ্ড বর্ণনা করেন। অপর সাক্ষী সমরনাথের ভাব অন্য-রূপ, তিনি বেশ স্ফূর্তির সহিত প্রকৃত রাজভক্তের ন্যায় এই খানাতল্লাসীর কার্য্য সুসম্পন্ন করেন, যেন to the manner born. খানাতল্লাসীতে বিশেষ কোন উল্লেখযোগ্য ঘটনা হয় নাই। তবে মনে পড়ে ক্ষুদ্র কার্ডবোর্ডের বাক্‌সে দক্ষিণেশ্বরের যে মাটি রক্ষিত ছিল, ক্লার্ক সাহেব তাহা বড় সন্দিগ্ধচিত্তে অনেকক্ষণ নিরীক্ষণ করেন, যেন তাঁহার মনে সন্দেহ হয় যে, এটা কি নূতন ভয়ঙ্কর তেজবিশিষ্ট স্ফোটক পদার্থ। এক হিসাবে ক্লার্ক সাহেবের সন্দেহ ভিত্তিহীন বলা যায় না। শেষে ইহা যে মাটি ভিন্ন আর কিছু নয়, এবং রাসায়নিক বিশ্লেষণকারীর নিকট পাঠান অনাবশ্যক, এই সিদ্ধান্তই গৃহীত হয়। আমি খানাতল্লাসীতে বাক্‌স খোলা ভিন্ন আর কোন কার্য্যে যোগদান করি নাই। আমাকে কোন কাগজ বা চিঠি দেখান বা পড়িয়া শুনান হয় নাই, মাত্র অলক-ধারীর একখানা চিঠি ক্রেগান সাহেব নিজের মনোরঞ্জনার্থ উচ্চৈঃস্বরে পড়েন। বন্ধুবর বিনোদ গুপ্ত তাঁহার স্বাভাবিক ললিত পদবিন্যাসে ঘর কম্পিত করিয়া ঘুরিয়া বেড়ান, শেল্‌ফ হইতে বা আর কোথা হইতে কাগজ বা চিঠি বাহির করেন, মাঝে মাঝে "অতি প্রয়োজনীয়, অতি প্রয়োজনীয়" বলিয়া তাহা ক্রেগানকে সমর্পণ করেন। এই প্রয়োজনীয় কাগজগুলি কি তাহা আমি জানিতে পারি নাই। সেই বিষয়ে কৌতূহলও ছিল না, কারণ আমি জানিতাম যে, আমার বাড়ীতে বিস্ফোরক পদার্থের প্রস্তুতপ্রণালী বা ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকার কোনও কাগজ থাকা অসম্ভব।

আমার ঘর তন্ন তন্ন করিয়া দেখিবার পর পুলিস পাশের ঘরে আমাদের লইয়া যায়। ক্রেগান আমার ছোট মাসীর বাক্‌স খুলেন, একবার দুইবার চিঠিতে দৃষ্টিপাত করেন মাত্র, তৎপরে মেয়েদের চিঠি নিয়ে দরকার নাই, এই বলিয়া তাহা ছাড়িয়া যান। তারপর একতলায় পুলিস মহাত্মাদের আবির্ভাব। একতলায় বসিয়া ক্রেগান চা পান করেন, আমি এক পেয়ালা কোকো ও রুটী খাই, সেই সুযোগে সাহেব তাঁহার রাজনৈতিক মতগুলি যুক্তি-তর্ক দেখাইয়া প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করেন—আমি অবিচলিতচিত্তে এই মানসিক যন্ত্রণা সহ্য করিলাম। তবে জিজ্ঞাসা করি, না হয় শরীরের উপর অত্যাচার করা পুলিসের সনাতন প্রথা, মনের উপরও এইরূপ অমানুষিক অত্যাচার করা কি unwritten law-এর চতুঃসীমার মধ্যে আসে? আশা করি আমাদের পরম মান্য দেশহিতৈষী শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ এই সম্বন্ধে ব্যবস্থাপক সভায় প্রশ্ন উত্থাপন করিবেন।

নীচের ঘরগুলি ও "নবশক্তি" আফিসের খানাতল্লাসীর পর পুলিস "নবশক্তি"র একটি লোহার সিন্দুক খুলিতে আবার দোতালায় যায়। আধ ঘন্টা চেষ্টা করিয়া যখন অকৃতকার্য্য হইল তখন তাহা থানায় লইয়া যাওয়াই ঠিক হইল। এইবার একজন পুলিস সাহেব একটি দ্বিচক্রযান আবিষ্কার করেন, তাহার উপর রেলের লেবেলে কুষ্ঠিয়ার নাম ছিল। অমনি কুষ্ঠিয়ায় সাহেবকে যে গুলি করে তাহারই বাহন বলিয়া এই গুরুতর প্রমাণ সানন্দে লইয়া যান।

প্রায় সাড়ে এগারটার সময় আমরা বাটী হইতে যাত্রা করিলাম। ফটকের বাহিরে আমার মেসো মহাশয় এবং শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ বসু গাড়ীতে উপস্থিত ছিলেন। মেসো মহাশয় আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোন্ অপরাধে গ্রেপ্তার হইলে?" আমি বলিলাম, "আমি কিছুই জানি না, ইহারা ঘরে প্রবেশ করিয়াই গ্রেপ্তার করেন, আমার হাতে হাতকড়ি দেন, বডি ওয়ারেন্ট দেখান নাই।" মেসো মহাশয় হাতকড়ি হাতে দেওয়ার কারণ জিজ্ঞাসা করায় বিনোদ বাবু বলিলেন, "মহাশয়, আমার অপরাধ নাই, অরবিন্দ বাবুকে জিজ্ঞাসা করুন, আমিই সাহেবকে বলিয়া হাতকড়ি খুলাইয়া নিলাম।" ভূপেন বাবু অপরাধ জিজ্ঞাসা করায় গুপ্ত মহাশয় নরহত্যার ধারা দেখাইলেন; ইহা শুনিয়া ভূপেন বাবু স্তম্ভিত হইলেন, আর কোনও কথা বলিলেন না। পরে শুনিলাম, আমার সলিসিটর শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত গ্রে ষ্ট্রীটে আসিয়া খানাতল্লাসীতে আমার পক্ষে উপস্থিত থাকিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন, পুলিস তাঁহাকে ফিরাইয়া দেয়।

আমাদের তিনজনকে থানায় লইয়া যাওয়া বিনোদ বাবুর ভার। থানায় তিনি আমাদের সঙ্গে বিশেষ ভদ্র ব্যবহার করিলেন। সেইখানেই স্নান ও আহার করিয়া লালবাজারে রওনা হইলাম। লালবাজারে কয়েক ঘন্টা বসাইয়া রয়ড ষ্ট্রীটে লইয়া যায়, সেই শুভ স্থানে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত কাটাইলাম। রয়ড ষ্ট্রীটে ডিটেক্‌টিভ পুঙ্গব মৌলবী শাম্‌স-উল-আলমের সহিত আমার প্রথম আলাপ ও প্রীতি স্থাপন হয়। মৌলবী সাহেবের তখন তত প্রভাব ও উৎসাহোদ্যম হয় নাই , বোমার মামলার প্রধান অন্বেষণকারী কিংবা নর্টন সাহেবের prompter বা জীবন্ত স্মরণশক্তিরূপে তিনি তখন বিরাজ করেন নাই, রামসদয় বাবুই তখন এই মামলার প্রধান পাণ্ডা। মৌলবী সাহেব আমাকে ধর্ম্ম সম্বন্ধে অতিশয় সরস বক্তৃতা শুনাইলেন। হিন্দুধর্ম্ম ও ইস্‌লাম ধর্ম্মের একই মূলমন্ত্র, হিন্দুদের ওঙ্কারের ত্রিমাত্রা অ উ ম, কোরাণের প্রথম তিন অক্ষর অ ল ম, ভাষাতত্ত্বের নিয়মে 'ল'-এর বদলে 'উ' ব্যবহার হয়, অতএব হিন্দু ও মুসলমানের একই মন্ত্র। তথাপি নিজের ধর্ম্মের পার্থক্য অক্ষুণ্ণ রাখিতে হয়, মুসলমানের সঙ্গে আহার করা হিন্দুর পক্ষে নিন্দনীয়। সত্যবাদী হওয়াও ধর্ম্মের একটি প্রধান অঙ্গ। সাহেবেরা বলেন অরবিন্দ ঘোষ হত্যাকারী দলের নেতা, ভারতবর্ষের পক্ষে ইহা বড় দুঃখ ও লজ্জার কথা, তবে সত্যবাদিতা রক্ষা

করিতে পারিলে situation saved হয়। মৌলবীর দৃঢ় বিশ্বাস, বিপিন পাল ও অরবিন্দ ঘোষের ন্যায় উচ্চচরিত্রবিশিষ্ট ব্যক্তিগণ যাহাই করিয়া থাকুন, তাহা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিবেন। শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র লাহিড়ী তথায় উপস্থিত ছিলেন, তিনি এই সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করিলেন, কিন্তু মৌলবী সাহেব নিজের মত ছাড়িলেন না। তাঁহার বিদ্যা-বুদ্ধি ও প্রবল ধর্ম্মভাব দেখিয়া আমি অতিশয় চমৎকৃত ও প্রীত হইলাম। নিজে বেশী কথা বলা ধৃষ্টতা মাত্র বিবেচনা করিয়া নম্রভাবে তাঁহার অমূল্য উপদেশ শুনিয়া লইলাম এবং তাহা সযত্নে হৃদয়ে অঙ্কিত করিলাম। এত ধর্ম্মভাবে মাতোয়ারা হইয়াও মৌলবী সাহেব ডিটেক্‌টিভগিরি ছাড়েন নাই। একবার বলিলেন, "আপনি যে আপনার ছোট ভাইকে বোমা তৈয়ার করিবার জন্য বাগানটি ছাড়িয়া দিলেন, বড় ভুল করিলেন, ইহা বুদ্ধিমানের কাজ হয় নাই।" তাঁহার কথার অর্থ বুঝিয়া আমি একটু হাসিলাম; বলিলাম, "মহাশয় বাগান যেমন আমার, তেমনি আমার ভাইয়ের, আমি যে তাহাকে ছাড়িয়া দিলাম, বা ছাড়িয়া দিলেও বোমা তৈয়ারী করিবার জন্য ছাড়িলাম, এ খবর কোথায় পাইলেন?" মৌলবী সাহেব অপ্রতিভ হইয়া বলিলেন, "না না, আমি বলিতেছি যদি তাহা করিয়া থাকেন।"এই ম হাত্মা নিজের জীবন চরিতের একটি পাতা আমাকে খুলিয়া দেখাইয়া বলিলেন, "আমার জীবনে যত নৈতিক বা আর্থিক উন্নতি হইয়াছে, আমার বাপের একটি অতিশয় মূল্যবান উপদেশই তাহার মূল কারণ। তিনি সর্ব্বদা বলিতেন, সম্মুখের অন্ন কখনও ছাড়িতে নাই। এই মহাবাক্য আমার জীবনের মূল-মন্ত্র, ইহা সর্ব্বদা স্মরণ করিয়াছি বলিয়া আমার এই উন্নতি।" ইহা বলিবার সময় মৌলবী সাহেব যে তীব্র দৃষ্টিতে আমার দিকে চাহিলেন, তাহাতে আমার বোধ হইল যেন আমিই তাঁহার সম্মুখের অন্ন। সন্ধ্যাবেলায় স্বনামখ্যাত শ্রীযুক্ত রামসদয় মুখোপাধ্যায়ের আবির্ভাব। তিনি আমার উপর অত্যন্ত দয়া ও সহানুভূতি প্রকাশ করিলেন, সকলকে আমার আহার ও শয্যা সম্বন্ধে যত্ন করিতে বলিলেন। পর মুহূর্ত্তে কয়েকজন আসিয়া আমাকে ও শৈলেন্দ্রকে লইয়া ঝড়বৃষ্টির মধ্যে লালবাজার হাজতে লইয়া যায়। রামসদয়ের সহিত এই একবার মাত্র আমার আলাপ হয়। বুঝিতে পারিলাম লোকটি বুদ্ধিমান ও উদ্যমশীল কিন্তু তাঁহার কথাবার্ত্তা, ভাবভঙ্গী, স্বর, চলন সবই কৃত্রিম ও অস্বাভাবিক, সর্ব্বদা যেন তিনি রঙ্গমঞ্চে অভিনয় করিতেছেন। এইরূপ এক একজন আছে যাহাদের শরীর, বাক্য, চেষ্টা যেন অনৃতের অবতার। তাহারা কাঁচা মনকে ভুলাইতে মজবুত, কিন্তু যাহারা মনুষ্য চরিত্রে অভিজ্ঞ বা অনেক দিন লোকের সঙ্গে মিশিয়াছে, তাহাদের নিকট প্রথম পরিচয়েই তাহারা ধরা পড়ে।

লালবাজারে দোতালায় একটি বড় ঘরে আমাদের দু'জনকে এক সঙ্গে রাখা হইল। আহার হইল অল্পমাত্র জলখাবার। অল্পক্ষণ পরে দুইজন ইংরাজ ঘরে প্রবেশ করেন, পরে শুনিলাম একজন স্বয়ং পুলিস কমিশনার হ্যালিডে

সাহেব। দুইজনে এক সঙ্গে আছি দেখিয়া হ্যালিডে সার্জ্জেন্টের উপর চটিয়া উঠিলেন, আমাকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন, খবরদার এই লোকটির সঙ্গে যেন কেহই না থাকে বা কথা বলে। সেই মুহূর্ত্তেই শৈলেনকে অন্য ঘরে সরাইয়া বন্ধ করে। আর সকলে যখন চলিয়া যায়, হ্যালিডে আমাকে জিজ্ঞাসা করেন, "এই কাপুরুষোচিত দুষ্কর্ম্মে লিপ্ত ছিলেন বলিয়া আপনার কি লজ্জা করে না?" "আমি লিপ্ত ছিলাম, ইহা ধরিয়া লইবার আপনার কি অধিকার?" উহার উত্তরে হ্যালিডে বলিলেন, "আমি ধরিয়া লই নাই, আমি সবই জানি।" আমি বলিলাম, "কি জানেন বা না জানেন আপনারাই অবগত, এই হত্যাকাণ্ডের সহিত সকল সম্পর্ক সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করি।" হ্যালিডে আর কোন কথা বলিলেন না।

সেই রাত্রে আমার আর কয়েকজন দর্শক আসে, ইহারাও পুলিস। ইহাদের আসার মধ্যে এক রহস্য নিহিত ছিল, সে রহস্য আমি আজ পর্য্যন্ত তলাইতে পারি নাই। গ্রেপ্তারের দেড় মাস আগে একটি অপরিচিত ভদ্রলোক আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন, তিনি বলেন, "মহাশয় আপনার সঙ্গে আমার আলাপ নাই, তবে আপনার উপর ভক্তি আছে বলিয়া আপনাকে সতর্ক করিতে আসিলাম, আর জানিতে চাই আপনার কোন্নগরের কোনও লোকের সঙ্গে কি আলাপ আছে, সেইখানে কখন কি গিয়াছিলেন বা সেখানে বাড়ী আছে কি?" আমি বলিলাম, "বাড়ী নাই, কোন্নগরে একবার গিয়াছিলাম, কয়েকজনের সঙ্গে আলাপও আছে।" তিনি বলিলেন, "আর কিছু বলিব না তবে ইহার পর কোন্নগরের কাহারও সহিত দেখা করিবেন না, আপনার ও আপনার ভাই বারীন্দ্রের বিরুদ্ধে দুষ্টেরা ষড়যন্ত্র করিতেছে, শীঘ্রই আপনাদিগকে তাহারা বিপদে ফেলিবে। আর আমাকে কোনও কথা জিজ্ঞাসা করিবেন না।" আমি বলিলাম, "মহাশয় এই অসম্পূর্ণ সংবাদে আমার কি উপকার হইল আমি বুঝিতে পারিলাম না, তবে উপকার করিতে আসিয়াছেন তাহার জন্য ধন্যবাদ। আমি আর কিছু জানিতে চাই না। ভগবানের উপর আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস, তিনিই সর্ব্বদা আমাকে রক্ষা করিবেন, সেই বিষয়ে নিজে চেষ্টা করা বা সতর্ক হওয়া নিষ্প্রয়োজন।" তাহার পরে এই সম্বন্ধে আর কোনও খবর পাই নাই। এই আমার অপরিচিত হিতৈষী যে মিথ্যা কল্পনা করেন নাই, এই রাত্রে তাহার প্রমাণ পাইলাম। একজন ইন্স্পেক্টর আর কয়েকজন পুলিস কর্ম্মচারী আসিয়া কোন্নগরের সমস্ত কথা জানিয়া লইলেন। তাঁহারা বলিলেন, "কোন্নগরে কি আপনার আদি স্থান? সেখানে বাড়ী আছে কি? সেইখানে কখনও গিয়াছিলেন? কবে গিয়াছিলেন? কেন গিয়াছিলেন? বারীন্দ্রের কোন্নগরে সম্পত্তি আছে কি?"––এইরূপ অনেক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন। ব্যাপারটা কি ইহা বুঝিবার জন্য আমি এই সব প্রশ্নের উত্তর দিতে লাগিলাম। এই চেষ্টায় কৃতকার্য্য হইলাম না, তবে প্রশ্নগুলির ও পুলিসের কথার ধরণে বোঝা গেল যে পুলিসে কি খবর পাইয়াছে তাহা সত্য কি মিথ্যা এই অনুসন্ধান

চলিতেছে। অনুমান করিলাম যেমন তাই-মহারাজের মোকদ্দমায় তিলককে ভণ্ড, মিথ্যাবাদী, প্রবঞ্চক ও অত্যাচারী প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা হইয়াছিল এবং সেই চেষ্টায় বোম্বে গবর্ণমেন্ট যোগদান করিয়া প্রজার অর্থের অপব্যয় করিয়াছিলেন,--তেমনই এস্থলেও কয়েকজন আমাকে বিপদে ফেলিবার চেষ্টা করিতেছিল।

রবিবার সমস্তদিন হাজতে কাটিয়া গেল। আমার ঘরের সম্মুখে সিঁড়ি ছিল। সকালে দেখিলাম কয়েকজন অল্পবয়স্ক বালক সিঁড়িতে নামিতেছে। মুখ চিনি না কিন্তু আন্দাজে বুঝিলাম ইহারাও এই মোকদ্দমায় ধৃত, পরে জানিতে পারিলাম ইহারা মানিকতলার বাগানের ছেলে। এক মাস পরে জেলে তাহাদের সঙ্গে আলাপ হয়। অল্পক্ষণ পরে হাত-মুখ ধুইতে আমাকেও নীচে লইয়া যায়--স্নানের বন্দোবস্ত নাই, কাজেই স্নান করিলাম না। সেই দিন সকালে আহারের মধ্যে ডাল ভাত সিদ্ধ, কয়েক গ্রাস জোর করিয়া উদরস্থ করিলাম, তাহার পর তাহা ত্যাগ করিতে হইল। বিকাল বেলা মুড়ি। তিন দিন ইহাই আমাদের আহার ছিল। কিন্তু ইহাও বলিতে হয় যে সোমবারে সার্জ্জেন্ট আমাকে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া চা ও রুটী খাইতে দিলেন।

পরে শুনিলাম আমার উকিল কমিশনারের নিকট বাড়ী হইতে আহার দিবার অনুমতি চাহিয়াছিলেন, হ্যালিডে সাহেব তাহাতে সম্মত হন নাই। ইহাও শুনিলাম যে, আসামীদের সঙ্গে উকিল বা এটর্নীর দেখা করা নিষিদ্ধ। জানি না এই নিষেধ আইনসঙ্গত কিনা? উকিলের পরামর্শ পাইলে আমার যদিও সুবিধা হইত, তবে নিতান্ত প্রয়োজন ছিল না বটে, কিন্তু তাহাতে অনেকের মোকদ্দমার ক্ষতি হইয়াছে। সোমবারে কমিশনারদের নিকট আমাদের হাজির করে। আমার সঙ্গে অবিনাশ ও শৈলেন ছিল। সকলকে ভিন্ন ভিন্ন দল করিয়া লইয়া যায়। আমরা তিনজনই পূর্ব্বজন্মের পুণ্যফলে পূর্ব্বে গ্রেপ্তার হইয়াছিলাম এবং আইনের জটিলতা কতকটা অনুভব করিয়াছিলাম বলিয়া তিনজনই কমিশনারের নিকট কোনও কথা বলিতে অস্বীকৃত হই। পরদিন ম্যাজিস্ট্রেট থর্ণহিলের কোর্টে আমাদের লইয়া যায়। এই সময় শ্রীযুক্ত কুমারকৃষ্ণ দত্ত, ম্যানুয়েল সাহেব আর আমার একজন আত্মীয়ের সহিত আমার প্রথম সাক্ষাৎ হয়। ম্যানুয়েল সাহেব আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "পুলিসে বলে আপনার বাড়ীতে অনেক সন্দেহজনক লেখা পাওয়া গিয়াছে। এইরূপ চিঠি বা কাগজ কি ছিল?" আমি বলিলাম, "নিঃসন্দেহে বলিতে পারি, ছিল না, থাকা সম্পূর্ণ অসম্ভব।" অবশ্য তখন মিষ্টান্ন পত্র ('sweets letter') বা 'scribbling' এর কথা জানিতাম না। আমার আত্মীয়কে বলিলাম, "বাড়ীতে ব'ল কোন ভয় যেন করে না, আমার নির্দ্দোষিতা সম্পূর্ণরূপে প্রমাণিত হইবে।" আমার মনে তখন হইতে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিয়াছিল যে ইহা হইবেই। প্রথম নির্জ্জন কারাবাসে মন একটু বিচলিত হয় কিন্তু তিন দিন প্রার্থনা ও ধ্যানে কাটানর ফলে নিশ্চলা শান্তি ও অবিচলিত বিশ্বাস পুনঃ প্রাণকে অভিভূত করে।

থর্ণহিল সাহেবের এজলাস হইতে আমাদের আলিপুরে গাড়ী করিয়া লইয়া যায়। এই দলে ছিল নিরাপদ, দীনদয়াল, হেমচন্দ্র দাস প্রভৃতি। ইহাদের মধ্যে হেমচন্দ্র দাসকে চিনিতাম, একবার মেদিনীপুরে তাঁহার বাড়ীতে উঠি। কে তখন জানিত যে এইরূপ বন্দীভাবে জেলের পথে তাঁহার সহিত দেখা হইবে। আলিপুরে আমাদের ম্যাজিষ্ট্রেটের কোর্টে কতক্ষণ থাকিতে হইল, কিন্তু ম্যাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে আমাদের হাজির করা হয় নাই, কেবল ভিতর হইতে তাহার হুকুম লিখাইয়া আনে। আমরা আবার গাড়িতে উঠিলাম; তখন একটি ভদ্রলোক আমার নিকট আসিয়া বলিলেন, "শুনিতেছি ইহারা আপনার নির্জ্জন কারাবাসের ব্যবস্থা করিয়াছেন, হুকুম লেখা হইতেছে। হয়ত কাহারও সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করিতে দিবে না। এইবার যদি বাড়ীর লোককে কিছু বলিতে চান, আমি সংবাদ পৌঁছাইয়া দিব।" আমি তাঁহাকে ধন্যবাদ দিলাম, কিন্তু যাহা বলিবার ছিল, তাহা আমার আত্মীয়ের দ্বারা জানান হইয়াছিল বলিয়া তাঁহাকে আর কিছু বলিলাম না। আমার উপর দেশের লোকের সহানুভূতি ও অযাচিত অনুগ্রহের দৃষ্টান্তরূপে এই ঘটনার উল্লেখ করিলাম। তৎপরে কোর্ট হইতে আমরা জেলে গিয়া জেলের কর্ম্মচারীগণের হাতে সমর্পিত হই। জেলে ঢুকিবার আগে আমাদের স্নান করায় , জেলের পোষাক পরাইয়া পিরান, ধুতি, জামা সংশোধিত করিবার জন্য লইয়া যায়। চারি দিন পরে আমরা স্নান করিয়া স্বর্গসুখ অনুভব করিলাম। স্নানের পর তাহারা সকলকে নিজ নিজ নির্দ্দিষ্ট ঘরে পৌঁছাইয়া দেয়, আমিও আমার নির্জ্জন কারাগারে ঢুকিলাম, ক্ষুদ্র ঘরের গরাদ বন্ধ হইল। ৫ই মে আলিপুরে কারাবাস আরম্ভ। পর-বৎসর ৬ই মে নিষ্কৃতি পাই।

আমার নির্জ্জন কারাগৃহটি নয় ফুট দীর্ঘ, পাঁচ ছয় ফুট প্রস্থ ছিল; ইহার জানালা নাই, সম্মুখভাগে বৃহৎ লোহার গরাদ, এই পিঞ্জরই আমার নির্দ্দিষ্ট বাসস্থান হইল। ঘরের বাহিরে একটি ক্ষুদ্র উঠান, পাথরের জমি, ইটের উচ্চ দেওয়াল, সামনে কাঠের দরজা। সেই দরজার উপরিভাগে মানুষের চক্ষুর সমান উচ্চতায় ক্ষুদ্র গোলাকার রন্ধ্র, দরজা বন্ধ হইলে শান্ত্রী এই রন্ধ্রে চক্ষু লাগাইয়া সময় সময় দেখে, কয়েদী কি করিতেছে। কিন্তু আমার উঠানের দরজা প্রায়ই খোলা থাকিত। এইরূপ ছয়টি ঘর পাশাপাশি, সেইগুলিকে ছয় ডিক্রী বলে। ডিক্রীর অর্থ বিশেষ সাজার ঘর--বিচারপতি বা জেলের সুপারিন্টেন্ডেন্টের হুকুমে যাহাদের নির্জ্জন কারাবাসের দণ্ড নির্দ্ধারিত হয় তাহাদেরই এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গহ্বরে থাকিতে হয়। এই নির্জ্জন কারাবাসেরও কম-বেশী আছে। যাহাদের বিশেষ সাজা হয়, তাহাদের উঠানের দরজা বন্ধ থাকে; মনুষ্য সংসার হইতে সম্পূর্ণ বঞ্চিত হইয়া শান্ত্রীর চক্ষু ও পরিবেশনকারী কয়েদীর দুবেলায় আগমন তাহাদের জগতের সঙ্গে একমাত্র সম্বন্ধ। আমা হইতেও হেমচন্দ্র দাস সি. আই. ডি.-র আতঙ্কস্থল বলিয়া তাহার জন্য এই ব্যবস্থা হইল। এই সাজার উপরও সাজা আছে,--হাতে-পায়ে হাতকড়া ও বেড়ী পরিয়া নির্জ্জন

কারাবাসে থাকা। এই চরম শাস্তি কেবল জেলের শান্তিভঙ্গ করা বা মারা-মারির জন্য নয়, বার বার খাটুনিতে ত্রুটি হইলেও এই শাস্তি হয়। নির্জ্জন কারাবাসের মোকদ্দমার আসামীকে শাস্তিস্বরূপ এইরূপ কষ্ট দেওয়া নিয়ম-বিরুদ্ধ, তবে স্বদেশী বা 'বন্দেমাতরম্'-কয়েদী নিয়মের বাহিরে, পুলিসের ইচ্ছায় তাহাদের জন্যও সুবন্দোবস্ত হয়।

আমাদের বাসস্থান ত এইরূপ ছিল, সাজ-সরঞ্জামের সম্বন্ধেও আমাদের সহৃদয় কর্ত্তৃপক্ষ আতিথ্য সৎকারের ত্রুটি করেন নাই। একখানা থালা ও একটি বাটি উঠানকে সুশোভিত করিত। উত্তমরূপে মাজা হইলে এই আমার সর্ব্বস্বস্বরূপ থালা-বাটির এমন রূপার ন্যায় চাক্‌চিক্য হইত যে, প্রাণ জুড়াইয়া যাইত এবং সেই নির্দ্দোষ কিরণময় উজ্জ্বলতার মধ্যে 'স্বর্গজগতে' নিখুঁত ব্রিটিশ রাজতন্ত্রের উপমা পাইয়া রাজভক্তির নিৰ্ম্মল আনন্দ অনুভব করিতাম। দোষের মধ্যে থালাও তাহা বুঝিয়া আনন্দে এত উৎফুল্ল হইত যে, একটু জোরে আঙুল দিলেই তাহা আরবীস্থানের ঘূর্ণ্যমান দরবেশের ন্যায় মণ্ডলাকারে নৃত্য করিতে থাকিত, তখন এক হাতে আহার করা, এক হাতে থালা ধরিয়া থাকা ভিন্ন উপায় ছিল না। নচেৎ ঘুরপাক খাইতে খাইতে জেলের অতুলনীয় মুষ্ট্যন্ন লইয়া তাহা পলাইয়া যাইবার উপক্রম করিত। থালা হইতে বাটিটিই আরও প্রিয় ও উপকারী জিনিষ ছিল। ইহা জড় পদার্থের মধ্যে যেন ব্রিটিশ সিভিলিয়ান। সিভিলিয়ানের যেমন সর্ব্বকার্য্যে স্বভাবজাত নৈপুণ্য ও যোগ্যতা আছে, জজ, শাসনকর্ত্তা, পুলিস, শুল্কবিভাগের কর্ত্তা, মিউনিসিপ্যালিটির অধ্যক্ষ, শিক্ষক, ধৰ্ম্মোপদেষ্টা, যাহা বল, তাহাই বলিবামাত্র হইতে পারে,—যেমন তাঁহার পক্ষে তদন্তকারী, অভিযোগকর্ত্তা, পুলিস বিচারক, এমন কি সময় সময় বাদীর পক্ষের কৌন্‌সিলীরও এক শরীরে এক সময়ে প্রীতিসম্মিলন হওয়া সুখসাধ্য, আমার আদরের বাটিরও তদ্রূপ। বাটির জাত নাই, বিচার নাই, কারাগৃহে যাইয়া সেই বাটিতে জল নিয়া শৌচক্রিয়া করিলাম, সেই বাটিতেই মুখ ধুইলাম স্নান করিলাম, অল্পক্ষণ পরে আহার করিতে হইল, সেই বাটিতেই ডাল বা তরকারী দেওয়া হইল, সেই বাটিতেই জলপান করিলাম এবং আচমন করিলাম। এমন সর্ব্বকার্য্যক্ষম মূল্যবান বস্তু ইংরাজের জেলেই পাওয়া সম্ভব। বাটি আমার এই সকল সাংসারিক উপকার করিয়া যোগসাধনের উপায় স্বরূপও হইয়া দাঁড়াইল। ঘৃণা পরিত্যাগের এমন সহায় ও উপদেষ্টা কোথায় পাইব? নির্জ্জন কারাবাসের প্রথম পালার পরে যখন আমাদের এক সঙ্গে রাখা হয়, তখন আমার সিভিলিয়ানের অধিকার পৃথকীকরণ হয়,—কর্ত্তৃপক্ষেরা শৌচ-ক্রিয়ার জন্য স্বতন্ত্র উপকরণের বন্দোবস্ত করেন। কিন্তু একমাসকালে এতদ্বারা এই অযাচিত ঘৃণা সংযম শিক্ষালাভ হইল। শৌচক্রিয়ার সমস্ত ব্যবস্থাই যেন এই সংযম শিক্ষার দিকে লক্ষ্য করিয়া বিহিত। বলা হইয়াছে, নির্জ্জন কারাবাস বিশেষ শাস্তির মধ্যে গণ্য এবং সেই শাস্তির মূলতত্ত্ব যথাসাধ্য মনুষ্য সংসর্গ ও মুক্ত আকাশ সেবা বর্জ্জন। বাহিরে শৌচের ব্যবস্থা হইলে এই তত্ত্ব ভঙ্গ হয়

বলিয়া ঘরের ভিতরেই দুইখানা আল্কাতরা মাখান টুকরী দেওয়া হইত। সকালে ও বিকাল বেলায় মেথর আসিয়া তাহা পরিষ্কার করিত, তীব্র আন্দোলন ও মর্ম্মস্পর্শী বক্তৃতা করিলে অন্য সময়েও পরিষ্কার করা হইত, কিন্তু অসময়ে পায়খানায় গেলে প্রায়ই প্রায়শ্চিত্তরূপে কয়েক ঘন্টা দুর্গন্ধ ভোগ করিতে হইত। নির্জ্জন কারাবাসের দ্বিতীয় পালায় এই সম্বন্ধে কতকটা রিফরম হয়, কিন্তু ইংরাজের রিফরম্ হইতেছে পুরাতন আমলের মূলতত্ত্ব সম্পূর্ণ বজায় রাখিয়া শাসনপ্রণালী সংশোধন। বলা বাহুল্য, এই ক্ষুদ্র ঘরে এমন ব্যবস্থা থাকায় সর্ব্বদা, বিশেষতঃ আহারের সময় এবং রাত্রিতে বিশেষ অশোয়াস্তি ভোগ করিতে হইত। জানি, শোবার ঘরের পার্শ্বে পায়খানা রাখা, স্থানে স্থানে বিলাতী সভ্যতার অঙ্গবিশেষ, কিন্তু একটি ক্ষুদ্র ঘরে শোবার ঘর, খাবার ঘর ও পায়খানা–– ইহাকেই too much of a good thing বলে। আমরা কু-অভ্যাসগ্রস্ত 'ভারতবাসী, সভ্যতার এত উচ্চ সোপানে পৌছা আমাদের পক্ষে কষ্টকর।

গৃহ-সামগ্রীর মধ্যে আরও ছিল একটি স্নানের বাল্তি, জল রাখিবার একটি টিনের নলাকার বাল্তি এবং দুটি জেলের কম্বল। স্নানের বাল্তি উঠানে রাখা হইত, সেইখানে স্নান করিতাম। আমার ভাগ্যে প্রথমতঃ জল-কষ্ট ছিল না কিন্তু তাহা পরে ঘটিয়াছিল। প্রথমতঃ পার্শ্বের গোয়াল ঘরের কয়েদী স্নানের সময় আমার ইচ্ছামত বাল্তিতে জল ভরিয়া দিত, সেইজন্য স্নানের সময়ই জেলের তপস্যার মধ্যে প্রত্যহ গৃহস্থের বিলাসবৃত্তি ও সুখ-প্রিয়তাকে তৃপ্ত করিবার অবসর। অপর আসামীদের ভাগ্যে ইহাও ঘটে নাই, এক বাল্তির জলেই তাহাদিগকে শৌচক্রিয়া, বাসন মাজা ও স্নান সম্পন্ন করিতে হইত। মোকদ্দমার আসামী বলিয়া এই অতিমাত্র বিলাস করিতে দেওয়া হইত, কয়েদীদের দুই-চারি বাটি জলে স্নান হইত। ইংরাজেরা বলে ভগবৎ প্রেম ও শরীরের স্বচ্ছন্দতা প্রায়ই সমান ও দুর্লভ সদ্গুণ, তাহাদের জেলে এই জাতীয় প্রবাদের যাথার্থ্য রক্ষণার্থ অথবা অতিরিক্ত স্নানসুখে কয়েদীর অনিচ্ছাজনিত তপস্যায় রসভঙ্গ ভয়ে এই ব্যবস্থা প্রচলিত, তাহা নির্ণয় করা কঠিন। আসামীরা কর্ত্তৃপক্ষদের এই দয়াকে কাকের স্নান বলিয়া তাচ্ছিল্য করিত। মানুষমাত্রই অসন্তোষপ্রিয়। স্নানের ব্যবস্থা হইতে পানীয় জলের ব্যবস্থা আরও চমৎকার। তখন গ্রীষ্মকাল, আমার ক্ষুদ্র ঘরে বাতাসের প্রবেশ প্রায় নিষিদ্ধ ছিল। কিন্তু মে মাসের উগ্র ও প্রখর রৌদ্র অবাধে প্রবেশ করিত। ঘরটি উত্তপ্ত উনুনের মত হইয়া উঠিত। এই উনুনে সিদ্ধ হইতে অদম্য জলতৃষ্ণা লাঘব করিবার উপায় ওই টিনের বাল্তির অর্দ্ধ-উষ্ণ জল। বার বার তাহা পান করিতাম, তৃষ্ণাতো যাইতই না বরং স্বেদ নির্গমন এবং অল্পক্ষণে নবীভূত তৃষ্ণাই লাভ হইত। তবে এক একজনের উঠানে মাটির কলসী রাখা ছিল, তাঁহারা পূর্ব্বজন্মকৃত তপস্যা স্মরণ করিয়া নিজেকে ধন্য মানিতেন। ইহাতে ঘোর পুরুষার্থবাদীকেও অদৃষ্ট মানিতে বাধ্য হইতে হয়, কাহারও ভাগ্যে ঠাণ্ডা জল জুটিত, কাহারও ভাগ্যে তৃষ্ণা লাগিয়াই থাকিত,

সব কপালের জোর। কর্ত্তৃপক্ষেরা কিন্তু সম্পূর্ণ পক্ষপাতশূন্য হইয়া কলসী বা টিন বিতরণ করিতেন। এই যদৃচ্ছা লাভে আমি সন্তুষ্ট হইলে বা না হইলেও আমার জলকষ্ট জেলের সহৃদয় ডাক্তার বাবুর অসহ্য হয়। তিনি কলসী যোগাড় করিতে উদ্যোগী হন, কিন্তু এই সব বন্দোবস্তে তাঁহার হাত নাই বলিয়া তিনি অনেক দিন তাহাতে কৃতকার্য্য হন নাই, শেষে তাঁহারই কথায় মুখ্য জমাদার কোথা হইতে কলসী আবিষ্কার করিল। তাহার আগেই আমি তৃষ্ণার সঙ্গে অনেক দিনের ঘোর সংগ্রামে পিপাসা-মুক্ত হইয়া উঠিয়াছিলাম। এই তপ্ত গৃহে আবার জেলে তৈয়ারী করা দুইটি মোটা কম্বলই আমাদের বিছানা। বালিস নাই, কাজেই একটি কম্বল পাতিয়া আর একটি কম্বল পাট করিয়া বালিস বানাইয়া শুইতাম। যখন গরমের ক্লেশ অসহ্য হইয়া আর থাকা যাইত না, তখন মাটীতে গড়াইয়া শরীর শীতল করিয়া আরাম লাভ করিতাম। মাতা বসুন্ধরার শীতল উৎসঙ্গ স্পর্শের কি সুখ, তাহা তখন বুঝিতাম। তবে জেলে সেই উৎসঙ্গ স্পর্শ বড় কোমল নয়, তদ্দ্বারা নিদ্রার আগমন বাধা-প্রাপ্ত হইত বলিয়া কম্বলের শরণ লইতে হইত। যে দিন বৃষ্টি হইত সেদিন বড় আনন্দের দিন হইত। ইহাতেও একটি এই অসুবিধা ছিল যে, ঝড়বৃষ্টি হইলেই ধূলা, পাতা ও তৃণসঙ্কুল প্রভঞ্জনের তাণ্ডব নৃত্যের পর আমার খাঁচার মধ্যে ছোট খাট একটি জলপ্লাবন হইত। তাহার পরে রাত্রিতে ভিজা কম্বল লইয়া ঘরের কোণে পলায়ন ভিন্ন উপায় ছিল না। প্রকৃতির এই লীলা বিশেষ সাঙ্গ হইলেও জলপ্লাবিত মাটি যতক্ষণ না শুকাইত ততক্ষণ নিদ্রার আশা পরিত্যাগ পূর্ব্বক চিন্তার আশ্রয় লইতে হইত, কেননা শৌচক্রিয়ার সামগ্রীর নিকটই একমাত্র শুষ্কস্থল থাকিত কিন্তু সেই দিকে কম্বল পাতিতে প্রবৃত্তি হইত না। এই সব অসুবিধা সত্ত্বেও ঝড়ের দিনে ভিতরে প্রচুর বাতাস আসিত এবং ঘরের সেই তপ্ত উনুন-তাত বিদূরিত হইত বলিয়া ঝড়বৃষ্টিকে সাদরে স্বাগত করিতাম।

আলিপুর গবর্ণমেন্ট হোটেলের যে বর্ণনা করিলাম, এবং ভবিষ্যতে আরও করিব, তাহা নিজের কষ্টভোগ জ্ঞাপন করিবার জন্য নয়;—সুসভ্য বৃটিশ রাজ্যে মোকদ্দমার আসামীর জন্য কি অদ্ভুত ব্যবস্থা, নির্দ্দোষীর দীর্ঘকাল-ব্যাপী কি যন্ত্রণা হইতে পারে, ইহা দেখাইবার জন্য এই বর্ণনা। যে সব কষ্টের কারণ দেখাইয়াছি, সে সব ছিল বটে, কিন্তু ভগবানের দয়া দৃষ্টি ছিল বলিয়া কয়েকদিন মাত্র এই কষ্ট অনুভব করিয়াছিলাম, তাহার পরে—কি উপায়ে তাহা পরে বলিব—মন সেই দুঃখের অতীত হইয়া কষ্ট অনুভব করিতে অসমর্থ হইয়াছিল। সেইজন্য জেলের স্মৃতি মনে উদয় হইলে ক্রোধ বা দুঃখ না হইয়া হাসিই পায়। যখন সর্ব্বপ্রথম জেলের বিচিত্র পোষাক পরিয়া আমার পিঞ্জরে ঢুকিয়া থাকিবার বন্দোবস্ত দেখিলাম তখন এই ভাবই মনে প্রকাশ পাইল। মনে মনে হাসিতে লাগিলাম। আমি ইংরাজ জাতির ইতিহাস ও আধুনিক আচরণ নিরীক্ষণ করিয়া তাহাদের বিচিত্র ও রহস্যময় চরিত্র অনেকদিন আগে বুঝিয়া লইয়াছিলাম; সেইজন্য আমার প্রতি তাহাদের এইরূপ ব্যবহার দেখিয়াও

কিছুমাত্র আশ্চর্য্যান্বিত বা দুঃখিত হইলাম না। সাধারণ দৃষ্টিতে আমাদের সহিত এইরূপ ব্যবহার করা তাহাদের পক্ষে অতিশয় অনুদার ও নিন্দনীয়। আমরা সকলে ভদ্রলোকের সন্তান, অনেকে জমিদারের ছেলে, কয়েকজন বংশে, বিদ্যায়, গুণে, চরিত্রে ইংলণ্ডের শীর্ষস্থানীয় লোকের সমকক্ষ। আমরা যে অভিযোগে ধৃত, তাহাও সামান্য খুন, চুরি, ডাকাতি নয়; দেশের জন্য বিদেশী রাজপুরুষদের সঙ্গে যুদ্ধ-চেষ্টা করা বা সমরোদ্যোগের ষড়যন্ত্র। তাহাতেও অনেকের দোষের সম্বন্ধে প্রমাণের নিতান্ত অভাব, পুলিসের সন্দেহই তাহাদের ধৃত হইবার একমাত্র কারণ। এইরূপ স্থলে সামান্য চোর-ডাকাতদের মত রাখা—চোর-ডাকাত কেন, পশুর ন্যায় পিঞ্জরে রাখিয়া পশুর অখাদ্য আহার খাওয়ান, জলকষ্ট, ক্ষুৎপিপাসা, রৌদ্র, বৃষ্টি, শীত সহ্য করান ইহাতে বৃটিশ রাজপুরুষদের ও বৃটিশ জাতির গৌরব বৃদ্ধি হয় না। ইহা কিন্তু তাঁহাদের জাতীয় চরিত্রগত দোষ। ইংরাজদের দেহে ক্ষত্রিয়োচিত গুণ থাকিলেও শত্রু বা বিরুদ্ধাচরণকারীর সঙ্গে ব্যবহার করিবার সময় তাঁহারা ষোল-আনা বেনে। আমার কিন্তু তখন বিরক্তি-ভাব মনে স্থান পায় নাই, বরং আমার ও দেশের সাধারণ অশিক্ষিত লোকের মধ্যে কোন প্রভেদ করা হয় নাই দেখিয়া একটু আনন্দিত হইয়াছিলাম, অধিকন্তু এই ব্যবস্থা মাতৃভক্তির প্রেমভাবে আহুতি দান করিল। একে বুঝিলাম যোগ শিক্ষা ও দ্বন্দ্বজয়ে অপূর্ব্ব উপকরণ ও অনুকূল অবস্থা পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে আমি চরমপন্থী দলের একজন, যাহাদের মতে প্রজাতন্ত্র এবং ধনী-দরিদ্রে সাম্য জাতীয় ভাবের একটি প্রধান অঙ্গ। মনে পড়িল সেই মতকে কার্য্যে পরিণত করা কর্ত্তব্য বলিয়া সুরাট যাত্রার সময় সকলে এক সঙ্গে তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রী হইয়াছিলাম, ক্যাম্পে নেতারা নিজেদের স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত না করিয়া সকলের সঙ্গে একভাবে এক ঘরে শুইতাম। ধনী, দরিদ্র, ব্রাহ্মণ, বৈশ্য, শূদ্র, বাঙ্গালী, মারাঠা, পাঞ্জাবী, গুজরাটি দিব্য ভ্রাতৃভাবে এক সঙ্গে থাকিতাম, শুইতাম, খাইতাম। মাটিতে শয্যা, ডাল-ভাত দহিই আহার, সর্ব্ববিষয়ে স্বদেশী ধরণের পরাকাষ্ঠা হইয়াছিল। কলিকাতা ও বোম্বে সহরের বিলাত-ফেরত ও মাদ্রাজের তিলক কাটা ব্রাহ্মণ-সন্তান এক সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছিলেন। এই আলিপুর জেলে বাসকালীন আমার দেশের কয়েদী, আমার দেশের চাষা, লোহার, কুমার, ডোম-বাগ্দীর সমান আহার, সমান থাকা, সমান কষ্ট, সমান মানমর্য্যাদা লাভ করিয়া বুঝিলাম সর্ব্বশরীরবাসী নারায়ণ এই সাম্যবাদ, এই একতা, এই দেশব্যাপী ভ্রাতৃভাবে সম্মত হইয়া যেন আমার জীবনব্রতে স্বাক্ষর দিয়াছেন। যেদিন জন্মভূমি-রূপিণী জগজ্জননীর পবিত্র মণ্ডপে দেশের সর্ব্ব শ্রেণী ভ্রাতৃভাবে একপ্রাণ হইয়া জগতের সম্মুখে উন্নতমস্তকে দাঁড়াইবেন, সহবাসী আসামী ও কয়েদীদের প্রেমপূর্ণ আচরণে এবং রাজপুরুষদের এই সাম্যভাবে এই কারাবাসে হৃদয়ের মধ্যে সেই শুভদিনের পূর্ব্বাভাস লাভ করিয়া কতবার হর্ষান্বিত ও পুলকিত হইতাম। সেদিন দেখিলাম পুনার "Indian Social Reformer" আমার

একটি সহজ বোধগম্য উক্তি লইয়া বিদ্রূপ করিয়া বলিয়াছেন, "জেলে ভগবৎ-সান্নিধ্যের বড় ছড়াছড়ি হইল দেখিতেছি!" হায়, মানসম্ভ্রমান্বেষী অল্প বিদ্যায়, অল্প সদ্‌গুণে গর্ব্বিত মানুষের অহঙ্কার ও অল্পতা! জেলে, কুটীরে, আশ্রমে, দুঃখীর হৃদয়ে ভগবৎপ্রকাশ না হইয়া বুঝি ধনীর বিলাস-মন্দিরে বা সুখান্বেষী স্বার্থান্ধ সংসারীর আরাম-শয্যায় তাহা সম্ভব? ভগবান বিদ্যা, সম্ভ্রম, লোক-মান্যতা, লোকপ্রশংসা, বাহ্যিক স্বচ্ছন্দতা ও সভ্যতা দেখেন না। তিনি দুঃখীর নিকটেই দয়াময়ী মাতৃরূপ প্রকাশ করেন। যিনি মানবমাত্রে, জাতিতে, স্বদেশে, দুঃখী গরীব পতিত পাপীতে নারায়ণকে দেখিয়া সেই নারায়ণের সেবায় জীবন সমর্পণ করেন তাঁহারই হৃদয়ে নারায়ণ আসিয়া বসেন। আর উত্থানোদ্যত পতিত জাতির মধ্যে দেশসেবকের নির্জ্জন কারাগারেই ভগবৎসান্নিধ্যের ছড়া-ছড়ি সম্ভব।

জেলর আসিয়া কম্বল ও থালা-বাটির বন্দোবস্ত করিয়া চলিয়া গেলে পর আমি কম্বলের উপরে বসিয়া জেলের দৃশ্য দেখিতে লাগিলাম। এই নির্জ্জন কারাবাস লালবাজার হাজত হইতে অনেক ভাল বোধ হইল। সেখানে সেই প্রকাণ্ড ঘরের নির্জ্জনতা যেন বিশাল বপু ছড়াইবার অবকাশ পাইয়া আরও নির্জ্জনতা বৃদ্ধি করে। এইখানে ক্ষুদ্র ঘরের দেওয়াল সঙ্গীস্বরূপ যেন নিকটে আসিয়া ব্রহ্মময় হইয়া আলিঙ্গন করিতে উদ্যত। সেইখানে দোতালার ঘরের অতি উচ্চ জানালা দিয়া বাহিরের আকাশও দেখা যায় না, এই জগতে গাছ-পালা, মানুষ, পশু-পক্ষী, বাড়ী-ঘর যে আছে তাহা অনেকবার কল্পনা করা কঠিন হয়। এই স্থানে উঠানের দরজা খোলা থাকায় গরাদের নিকটে বসিলে বাহিরে জেলের খোলা জায়গা ও কয়েদীদের যাতায়াত দেখা যায়। উঠানের দেওয়ালের গায়ে একটি বৃক্ষ ছিল, তাহার নয়নরঞ্জক নীলিমায় প্রাণ জুড়াইতাম। ছয় ডিক্রীর ছয়টি ঘরের সামনে যে শান্ত্রী ঘুরিয়া থাকে, তাহার মুখ ও পদশব্দ অনেকবার পরিচিত বন্ধুর ঘোরাফেরার মত প্রিয় বোধ হইত। ঘরের পার্শ্ববর্ত্তী গোয়ালঘরের কয়েদীরা ঘরের সম্মুখ দিয়া গরু চরাইতে লইয়া যাইত। গরু ও গোপাল নিত্য প্রিয় দৃশ্য ছিল। আলিপুরের নির্জ্জন কারাবাসে অপূর্ব্ব প্রেমশিক্ষা পাইলাম। এইখানে আসিবার আগে মানুষের মধ্যেও আমার ব্যক্তিগত ভালবাসা অতিশয় ক্ষুদ্র গণ্ডীতে আবদ্ধ ছিল এবং পশু-পক্ষীর উপর রুদ্ধ প্রেমস্রোত প্রায় বহিত না। মনে আছে রবিবাবুর একটি কবিতায় মহিষের উপর গ্রাম্য বালকের গভীর ভালবাসা বড় সুন্দরভাবে বর্ণিত আছে, সেই কবিতা প্রথম পড়িয়া কিছুতেই তাহা আমার হৃদয়ঙ্গম হয় নাই, ভাবের বর্ণনায় অতিশয়োক্তি ও অস্বাভাবিকতা দোষ দেখিয়াছিলাম। এখন পড়িলে তাহা অন্য চক্ষে দেখিতাম। আলিপুরে বসিয়া বুঝিতে পারিলাম, সর্ব্বপ্রকার জীবের উপর মানুষের প্রাণে কি গভীর ভালবাসা স্থান পাইতে পারে, গরু, পাখী, পিপীলিকা পর্য্যন্ত দেখিয়া কি তীব্র আনন্দ স্ফুরণে মানুষের প্রাণ অস্থির হইতে পারে।

কারাবাসের প্রথম দিন শান্তিতে কাটিয়া গেল। সবই নূতন, তাহাতে মনে স্ফূর্ত্তি হইল। লালবাজার হাজতের সঙ্গে তুলনা করিয়া এই অবস্থাতেই প্রীতিলাভ করিলাম এবং ভগবানের উপর নির্ভর ছিল বলিয়া এখানে নির্জ্জনতা বোধ হয় নাই। জেলের আহারের অদ্ভুত চেহারা দেখিয়াও এই ভাবের ব্যাঘাত হয় নাই। মোটা ভাত, তাহাতেও খোলা, কঙ্কর, পোকা, চুল, ময়লা ইত্যাদি কত প্রকার মশলা দেওয়া,--স্বাদহীন ডালে জলের ভাগ অধিক, তরকারীর মধ্যে ঘাস-পাতা শুদ্ধ শাক। মানুষের আহার যে এত স্বাদহীন নিঃসার হইতে পারে, তাহা আমি আগে জানিতাম না। এই শাকের বিমর্ষ গাঢ় কৃষ্ণ মূর্ত্তি দেখিয়াই ভয় পাইলাম, দুই গ্রাস খাইয়া তাহাকে ভক্তিপূর্ণ নমস্কার করিয়া বর্জ্জন করিলাম। সকল কয়েদীর ভাগ্যে একই তরকারী জোটে, এবং একবার কোন প্রকার তরকারী আরম্ভ হইলে তাহা অনন্তকাল চলিতে থাকে। এই সময় শাকের রাজত্ব ছিল। দিন যায়, পক্ষ যায়, মাস যায়, কিন্তু দুবেলা শাকের তরকারী, ঐ ডাল, ঐ ভাত। জিনিষটা বদলান দূরের কথা চেহারারও লেশমাত্র পরিবর্ত্তন হয় নাই, তাহার ঐ নিত্য সনাতন অনাদ্যনন্ত অপরিণামাতীত অদ্বিতীয় রূপ। দুই সন্ধ্যার মধ্যেই কয়েদীকে এই নশ্বর মায়াজগতের স্থায়িত্ব সম্বন্ধে প্রতীতি জন্মাইবে। এই বিষয়েও অন্য আসামী হইতে আমার ভাগ্য সুপ্রসন্ন ছিল, তাহাও ডাক্তারবাবুর দয়ায়। তিনি আমার জন্য হাস্পাতাল হইতে দুধের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, তদ্দ্বারা কয়েকদিন শাক-দর্শন হইতে পরিত্রাণ পাইয়াছিলাম।

সেই রাত্রে সকাল সকাল ঘুমাইলাম, কিন্তু নিশ্চিন্ত নিদ্রাভোগ করা নির্জ্জন কারাবাসের নিয়ম নয়, তাহাতে কয়েদীর সুখপ্রিয়তা জাগিতে পারে। সেই জন্য এই নিয়ম আছে যে, যতবার পাহারা বদলায়, ততবার কয়েদীকে ডাক হাঁক করিয়া উঠাইতে হয়, সাড়া না দিলে ছাড়িতে নাই। যাঁহারা যাঁহারা ছয় ডিক্রীতে পাহারা দিতেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকে এই কর্ত্তব্যপালনে বিমুখ ছিলেন,--সিপাহীদের মধ্যে প্রায়ই কঠোর কর্ত্তব্য জ্ঞান অপেক্ষা দয়া ও সহানুভূতির ভাব অধিক ছিল, বিশেষতঃ হিন্দুস্থানীদের স্বভাব এইরূপ। কয়েকজন কিন্তু ছাড়ে নাই। তাহারা আমাদিগকে এইরূপে উঠাইয়া এই কুশল সংবাদ জিজ্ঞাসা করিত, "বাবু ভাল আছেন ত?" এই অসময় রহস্য সব সময় প্রীতিকর হইত না, তবে বুঝিলাম যাহারা এইরূপ করিতেছে তাহারা সরলভাবে নিয়ম বলিয়া আমাদিগকে উঠাইতেছে। কয়েক দিন বিরক্ত হইয়াও ইহা সহ্য করিলাম, শেষে নিদ্রা রক্ষার জন্য ধমক দিতে হইল। দুই চারিবার ধমক দিবার পরে দেখিলাম, রাত্রে কুশল সংবাদ নেওয়া প্রথা আপনিই উঠিয়া গেল।

পরদিন সকালে চারিটা বাজিয়া পনের মিনিটে জেলের ঘন্টা বাজিল। কয়েদীদের উঠাইবার জন্য এই প্রথম ঘন্টা। কয়েক মিনিট পর আবার ঘন্টা বাজে, তাহার পর কয়েদীরা ফাইলে বাহিরে আসে, হাত মুখ ধুইয়া লফ্‌সী খাইয়া খাটুনি আরম্ভ করে। এত ঘন্টা বাজানোর মধ্যে ঘুম হওয়া অসম্ভব

বুঝিয়া আমিও উঠিলাম। ৫টার সময় গরাদ খোলা হয়, আমি হাত-মুখ ধুইয়া আবার ঘরে বসিলাম। অল্পক্ষণ পরে লফ্‌সী আমার দরজায় হাজির হইল কিন্তু সেই দিন তাহা খাই নাই, কেবল তাহার সহিত চাক্ষুষ পরিচয় হইল। ইহার কয়েকদিন পরে প্রথমবার এই পরমান্ন ভোগ হয়। লফ্‌সীর অর্থ ফেনের সহিত সিদ্ধ ভাত, ইহাই কয়েদীর ছোট হাজরী। লফ্‌সীর ত্রিমূত্তি বা তিন অবস্থা আছে। প্রথম দিন লফ্‌সীর প্রাজ্ঞভাব, অমিশ্রিত মূলপদার্থ, শুদ্ধ শিব শুভ্রমূত্তি। দ্বিতীয় দিন লফ্‌সীর হিরণ্যগর্ভ, ডালে সিদ্ধ, খিচুড়ি নামে অভিহিত, পীতবর্ণ, নানা ধর্ম্মসঙ্কুল। তৃতীয় দিনে লফ্‌সীর বিরাট মূত্তি অল্প গুড়ে মিশ্রিত, ধূসর বর্ণ, কিয়ৎ পরিমাণে মনুষ্যের ব্যবহার যোগ্য। আমি প্রাজ্ঞ ও হিরণ্য-গর্ভ সেবন সাধারণ মর্ত্ত্য মনুষ্যের অতীত বলিয়া ত্যাগ করিয়াছিলাম, এক একবার বিরাটের দুগ্রাস উদরস্থ করিয়া বৃটিশ রাজত্বের নানা সদ্‌গুণ ও পাশ্চাত্য সভ্যতার উচ্চ দরের humanitarianism ভাবিতে ভাবিতে আনন্দে মগ্ন হইতাম। বলা উচিত লফ্‌সীই বাঙ্গালী কয়েদীর একমাত্র পুষ্টিকর আহার, আর সবই সারশূন্য। তাহা হইলেও বা কি হইবে? তাহার যেরূপ স্বাদ, তাহা কেবল ক্ষুধার চোটেই খাওয়া যায়, তাহাও জোর করিয়া, মনকে কত বুঝাইয়া তবে খাইতে হয়।

সেদিন সাড়ে এগারটার সময় স্নান করিলাম। প্রথম চারি পাঁচ দিন বাড়ী হইতে যাহা পরিয়া আসিয়াছিলাম, তাহাই পরিয়া থাকিতে হইল। তবে স্নানের সময় যে গোয়ালঘরের বৃদ্ধ কয়েদী ওয়ার্ডার আমার রক্ষণাবেক্ষণে নিযুক্ত হইয়াছিলেন তিনি একটি এণ্ডির দেড় হাত চওড়া কাপড় যোগাড় করিয়াছিলেন, আমার একমাত্র বস্ত্র শুকান পর্য্যন্ত ইহা পরিয়া বসিয়া থাকিতাম। আমায় কাপড় কাচিতে বা বাসন মাজিতে হইত না, গোয়ালঘরে একজন কয়েদী ইহা করিত। এগারটার সময় খাওয়া। ঘরে চুপড়ির সান্নিধ্য বর্জ্জন করিবার জন্য গ্রীষ্মের রৌদ্র সহ্য করিয়া প্রায়ই উঠানে খাইতাম। শান্ত্রীও ইহাতে বাধা দিতেন না। সন্ধ্যার খাওয়া পাঁচটা, সাড়ে পাঁচটার সময় হইত। তাহার পর আর গারদ খোলা নিষিদ্ধ ছিল। সাতটার সময় সন্ধ্যার ঘন্টা বাজে। মুখ্য জমাদার কয়েদী ওয়ার্ডারদের একত্র করিয়া উচ্চৈঃস্বরে নাম পড়িয়া যান, তাহার পরে সকলে স্ব স্ব স্থানে যায়। শ্রান্ত কয়েদী নিদ্রার শরণ লইয়া জেলের সেই একমাত্র সুখ অনুভব করে। এই সময় দুর্ব্বলচেতা নিজের দুর্ভাগ্য বা ভবিষ্যৎ জেলদুঃখ ভাবিয়া কাঁদে। ভগবদ্ভক্ত, নীরব রাত্রিতে ঈশ্বর-সান্নিধ্য অনুভব করিয়া প্রার্থনায় বা ধ্যানে আনন্দ ভোগ করেন। রাত্রিতে এই দুর্ভাগ্য পতিত সমাজ-পীড়িত তিন সহস্র ঈশ্বরসৃষ্ট প্রাণীর সেই আলিপুর জেল স্বরূপ প্রকাণ্ড যন্ত্রণাগৃহ বিশাল নীরবতায় মগ্ন হয়।

যাঁহারা আমার সঙ্গে এক অভিযোগে অভিযুক্ত, তাঁহাদের সঙ্গে জেলে প্রায়ই

দেখা হইত না। তাঁহারা স্বতন্ত্র স্থানে রক্ষিত ছিলেন। ছয় ডিক্রীর পশ্চাদ্ভাগে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘরের দুটি লাইন ছিল, এই দুটি লাইনে সব শুদ্ধ চুয়াল্লিশটি ঘর, সেই জন্য ইহাকে চুয়াল্লিশ ডিক্রী বলে। এই ডিক্রীর একটি লাইনে অধিকাংশ আসামীর বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট ছিল। তাঁহারা cell-এ আবদ্ধ হইয়াও নির্জ্জন কারাবাস ভোগ করেন নাই, কেন না এক ঘরে তিনজন করিয়া থাকিতেন। জেলের অন্য দিকে আর একটি ডিক্রী ছিল, তাহাতে কয়েকটি বড় ঘর ছিল; এক একটি ঘরে বারজন পর্য্যন্ত থাকিতে পারিত। যাঁহাদের ভাগ্যে এই ডিক্রী পড়িত, তাঁহারা অধিক সুখে থাকিতেন। এই ডিক্রীতে অনেকে এক ঘরে আবদ্ধ ছিলেন, তাঁহারা রাত দিন গল্প করিবার অবসর ও মনুষ্যসংসর্গ লাভ করিয়া সুখে কালযাপন করিতেন। তবে তাঁহাদের মধ্যে একজন এই সুখে বঞ্চিত ছিলেন। ইনি হেমচন্দ্র দাস। জানি না কেন ইঁহার উপর কর্ত্তৃপক্ষের বিশেষ ভয় অথবা ক্রোধ ছিল, এত লোকের মধ্যে নির্জ্জন কারাবাসের যন্ত্রণা ভোগ করাইবার জন্য কর্ত্তৃপক্ষ তাঁহাকেই স্বতন্ত্র করিয়াছিলেন। হেমচন্দ্রের নিজের ধারণা ছিল যে, পুলিস অশেষ চেষ্টা করিয়াও তাঁহাকে দোষ স্বীকার করাইতে পারেন নাই বলিয়া তাঁহার উপর এই ক্রোধ। তাঁহাকে এই ডিক্রীর একটি অতি ক্ষুদ্র ঘরে আবদ্ধ করিয়া বাহিরের দরজা পর্য্যন্ত বন্ধ করিয়া রাখা হইত। বলিয়াছি, ইহাই এই বিশেষ সাজার চরম অবস্থা। মাঝে মাঝে পুলিস নানা জাতির, নানা বর্ণের, নানা আকৃতির সাক্ষী আনাইয়া identification প্রহসন অভিনয় করাইত। তখন আমাদের সকলকে আফিসের সম্মুখে এক দীর্ঘ শ্রেণীবদ্ধ করিয়া দাঁড় করাইত। জেলের কর্ত্তৃপক্ষেরা আমাদের সঙ্গে জেলের অন্য অন্য মোকদ্দমার আসামী মিশাইয়া তাহাদিগকে দেখাইতেন। ইহা কিন্তু নামের জন্য। এই আসামীদের মধ্যে শিক্ষিত বা ভদ্রলোক একজনও ছিল না, যখন তাহাদের সহিত এক শ্রেণীতে দাঁড়াইতাম, তখন এই দুই প্রকার আসামীবর্গের এত অমিল থাকিত যে, এক দিকে বোমার মোকদ্দমায় অভিযুক্ত বালকদের তেজস্বী তীক্ষ্ণবুদ্ধি প্রকাশক মুখের ভাব ও গঠন এবং অন্যদিকে সাধারণ আসামীর মলিন পোষাক ও নিস্তেজ মুখের চেহারা দেখিয়া কে কোন্ শ্রেণীর লোক তাহা যিনি নির্ণয় করিতে না পারিতেন, তাঁহাকে নির্ব্বোধ কেন, নিকৃষ্ট মনুষ্যবুদ্ধিরহিত বলিতে হয়। এই identification প্যারেড আসামীদের অপ্রিয় ছিল না। এতদ্দ্বারা জেলের একঘেয়ে জীবনে একটি বৈচিত্র্য হইত, এবং পরস্পরকে দুটি কথাও বলিবার অবকাশ পাওয়া যাইত। গ্রেপ্তারের পর এইরূপ একটি প্যারেডে আমার ভাই বারীন্দ্রকে প্রথম দেখিতে পাইলাম, কিন্তু তাহার সঙ্গে তখন কথা হয় নাই। প্রায়ই নরেন্দ্রনাথ গোস্বামীই আমার পার্শ্বে দাঁড়াইতেন, সেই জন্য তাঁহার সঙ্গে তখন এই সময়ে আলাপ একটু অধিক হইয়াছিল। গোঁসাই অতিশয় সুপুরুষ, লম্বা, ফরসা, বলিষ্ঠ, পুষ্টকায় কিন্তু তাঁহার চোখের ভাব কুবৃত্তি প্রকাশক ছিল, কথায়ও বুদ্ধিমত্তার কোন লক্ষণ পাই নাই। এই বিষয়ে অন্য যুবকদের সঙ্গে তাঁহার বিশেষ প্রভেদ ছিল।

তাঁহাদের মুখে প্রায়ই উচ্চ ও পবিত্র ভাব অধিক এবং কথায় প্রখর বুদ্ধি, জ্ঞান-লিপ্সা ও মহৎ স্বার্থহীন আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ পাইত। গোঁসাইয়ের কথা নির্ব্বোধ ও লঘুচেতা লোকের কথার ন্যায় হইলেও তেজ ও সাহসপূর্ণ ছিল। তাঁহার তখন সম্পূর্ণ বিশ্বাস ছিল যে, তিনি খালাস পাইবেন। তিনি বলিতেন, "আমার বাবা মোকদ্দমার কীট, তাঁহার সঙ্গে পুলিস কখনও পারিবে না। আমার এজাহারও আমার বিরুদ্ধে যাইবে না, প্রমাণিত হইবে পুলিস আমাকে শারীরিক যন্ত্রণা দিয়া এজাহার করাইয়াছে।" আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "তুমি পুলিসের হাতে ছিলে। সাক্ষী কোথায়?" গোঁসাই অম্লানবদনে বলিলেন, "আমার বাবা কত শত মোকদ্দমা করিয়াছেন, ও সব বেশ বোঝেন। সাক্ষীর অভাব হইবে না।" এইরূপ লোকই Approver হয়।

ইতিপূর্ব্বে আসামীর অনর্থক অসুবিধা ও নানা কষ্টের কথা বলা হইয়াছে কিন্তু ইহাও বলা উচিত যে এই সকলই জেলের প্রণালীর দোষ; এই সকল কষ্ট জেলের কাহারও ব্যক্তিগত নিষ্ঠুরতা বা মনুষ্যোচিত গুণের অভাবে হয় নাই। বরং আলিপুর জেলে যাঁহাদের উপর কর্তৃত্বের ভার ছিল, তাঁহারা সকলেই অতিশয় ভদ্র, দয়াবান এবং ন্যায়পরায়ণ। যদি কোনও জেলে কয়েদীর যন্ত্রণার কম হয়, য়ুরোপীয় জেল প্রণালীর অমানুষিক বর্ব্বরতা দয়ায় ও ন্যায়-পরায়ণতায় লঘুকৃত হয়, তবে আলিপুর জেলে ও এমারসন সাহেবের রাজত্বে সেই মন্দের ভাল ঘটিয়াছে। এই ভাল হইবার দুটি প্রধান কারণ জেলের ইংরাজ সুপারিন্টেণ্ডেন্ট এমারসন সাহেব ও বাঙ্গালী হাসপাতাল আসিষ্টান্ট ডাক্তার বৈদ্যনাথ চাটার্জির অসাধারণ গুণ। ইঁহাদের মধ্যে একজন য়ুরোপের লুপ্তপ্রায় খৃষ্টান আদর্শের অবতার, অপরটি হিন্দুধর্ম্মের সারমর্ম্ম দয়া ও পরোপকারের জীবন্ত মূর্ত্তি। এমারসন সাহেবের মত ইংরাজ আর এই দেশে বড় আসে না, বিলাতেও আর বড় জন্মায় না। তাঁহার শরীরে খৃষ্টান gentleman-এর যে সকল গুণ হওয়া উচিত, সকলই এক সময়ে অবতীর্ণ হইয়াছে। তিনি শান্তিপ্রিয়, বিচারশীল, দয়াদাক্ষিণ্যে অতুলনীয়, ন্যায়বান; ভদ্র ব্যবহার ভিন্ন অধমের প্রতিও অভদ্রতা প্রকাশ করিতে স্বভাবতঃ অক্ষম, সরল, অকপট, সংযমী। দোষের মধ্যে তাঁহার কর্ম্মকুশলতা ও উদ্যম কম ছিল, জেলরের উপর সমুদয় কর্ম্মভার অর্পণ করিয়া তিনি স্বয়ং নিশ্চেষ্ট থাকিতেন। ইহাতে যে বড় বেশী ক্ষতি হইয়াছিল, তাহা আমার বোধ হয় না। জেলর যোগেন্দ্রবাবু দক্ষ ও যোগ্য পুরুষ ছিলেন, বহুমূত্র রোগে অতিশয় ক্লিষ্ট হইয়াও স্বয়ং কার্য্য দেখিতেন এবং সাহেবের স্বভাব চিনিতেন বলিয়া জেলে ন্যায়নিষ্ঠা ও ক্রূরতার অভাবই রক্ষা করিতেন। তবে তিনি এমারসনের মত মহাত্মা লোক ছিলেন না, সামান্য বাঙ্গালী সরকারী ভৃত্য মাত্র, সাহেবের মন রাখিতে জানিতেন, দক্ষতা ও কর্ত্তব্যবুদ্ধির সহিত কর্ম্ম করিতেন, স্বাভাবিক ভদ্রতা ও শান্তভাবের সহিত লোকের সঙ্গে ব্যবহার করিতেন, ইহা ছাড়া তাঁহার মধ্যে কোন বিশেষ গুণ লক্ষ্য করি নাই। চাকরীর উপর তাঁহার প্রবল মায়া

ছিল। বিশেষতঃ তখন মে মাস, পেনশন নিবার সময় তাঁহার নিকটবর্ত্তী হইয়াছিল, জানুয়ারীতে পেনশন নিয়া দীর্ঘ পরিশ্রমোপার্জ্জিত বিশ্রাম ভোগ করিবার আশা তখন বর্ত্তমান ছিল। আলিপুরের বোমার মোকদ্দমার আসামীর আবির্ভাব দেখিয়া আমাদের জেলর মহাশয় নিতান্ত ভীত ও চিন্তিত হইয়াছিলেন। এই সকল উগ্রস্বভাব তেজস্বী বাঙ্গালী বালক কোন্ দিনে কি কাণ্ড করিয়া বসিবেন, এই ভাবনায় তিনি অস্থির হইয়া থাকিতেন। তিনি বলিতেন, তালগাছে চড়িতে আর দেড়ইঞ্চি বাকী। কিন্তু সেই দেড়ইঞ্চির অর্দ্ধেকটা মাত্র তিনি চড়িতে পারিয়াছিলেন। আগষ্ট মাসের শেষেই বোকানন সাহেব জেলে পর্য্যবেক্ষণ করিতে আসিয়া সন্তুষ্ট হইয়া গেলেন। জেলর মহাশয় আনন্দে বলিলেন, "আমার কর্ম্মকালে এই সাহেবের শেষ আসা, আর পেনশনের ভয় নাই।" হায়, মানুষ মাত্রের অন্ধতা! কবি যথার্থই বলিয়াছেন, বিধি দুঃখী মনুষ্যের দুটি পরম উপকার করিয়াছেন। প্রথম, ভবিষ্যৎ নিবিড় অন্ধকারে ঢাকিয়া রাখিয়াছেন, দ্বিতীয়, তাহার একমাত্র অবলম্বন ও সান্ত্বনাস্থল স্বরূপ অন্ধ আশা তাহাকে দিয়াছেন। এই উক্তির চার পাঁচদিন পরেই নরেন গোঁসাই কানাইয়ের হস্তে হত হইলেন, বোকাননের জেলে ঘন ঘন আসা আরম্ভ হইল। তাহার ফলে যোগেন্দ্র বাবুর অকালে কর্ম্ম গেল এবং শোক ও রোগের মিলিত আক্রমণে তাঁহার দেহত্যাগও ঘটিল। এইরূপ কর্ম্মচারীর উপর সম্পূর্ণ ভার না দিয়া এমারসন সাহেব যদি স্বয়ং সব কার্য্য দেখিতেন, তাহা হইলে তাঁহার রাজত্বকালে আলিপুর জেলের অধিক সংস্কার ও উন্নতি হইবার সম্ভাবনা ছিল। তিনি যতটুকু দেখিতেন, তাহা সুসম্পন্নও করিতেন, তাঁহার চরিত্রগত গুণেও জেলটি নরক না হইয়া মানুষের কঠোর শাস্তির স্থানই হইয়া রহিয়াছিল। তিনি অন্যত্র গেলেও তাঁহার সাধুতার ফল সম্পূর্ণ ঘুচে নাই, এখনও পরবর্ত্তী কর্ম্মচারীগণ তাঁহার সাধুতা দশ আনা বজায় রাখিতে বাধ্য হইয়াছেন।

যেমন জেলের অন্যান্য বিভাগে বাঙ্গালী যোগেন বাবু হর্ত্তাকর্ত্তা ছিলেন, তেমনই হাসপাতালে বাঙ্গালী ডাক্তার বৈদ্যনাথ বাবু সর্ব্বেসর্ব্বা ছিলেন। তাঁহার উপরিতন কর্ম্মচারী ডাক্তার ডেলী, এমারসন সাহেবের ন্যায় দয়াবান না হইয়াও অতিশয় ভদ্রলোক ও বিচক্ষণ ব্যক্তি ছিলেন। তিনি বালকদের শান্ত আচরণ, প্রফুল্লতা ও বাধ্যতা দেখিয়া অশেষ প্রশংসা করিতেন এবং অল্পবয়স্কদের সহিত হাসিতামাসা ও অপর আসামীদের সহিত রাজনীতি, ধর্ম্ম ও দর্শনবিষয়ক চর্চ্চা করিতেন। ডাক্তার সাহেব আইরিশ বংশজাত, সেই উদার ও ভাবপ্রবণ জাতির অনেক গুণ তাঁহার শরীরে আশ্রয় লাভ করিয়াছিল। তাঁহার লেশমাত্র ক্রূরতা ছিল না, এক একবার ক্রোধের বশবর্ত্তী হইয়া রূঢ় কথা বা কঠোর আচরণ করিতেন কিন্তু প্রায়ই উপকার করাই তাঁহার প্রিয় ছিল। তিনি জেলের কয়েদীদের চাতুরী ও কৃত্রিম রোগ দেখিতে অভ্যস্ত ছিলেন, কিন্তু

এমনও হইত যে প্রকৃত রোগীকেও এই কৃত্রিমতার ভয়ে উপেক্ষা করিতেন, তবে প্রকৃত রোগ বুঝিতে পারিলে অতি যত্ন ও দয়ার সহিত রোগীর ব্যবস্থা করিতেন। আমার একবার সামান্য জ্বর হয়। তখন বর্ষাকাল, অনেক বাতায়নযুক্ত প্রকাণ্ড দালানে জলসিক্ত মুক্ত বায়ু খেলা করিত, তথাপি আমি হাসপাতালে যাইতে বা ঔষধ খাইতে অনিচ্ছুক ছিলাম। রোগ ও চিকিৎসা সম্বন্ধে আমার মত পরিবর্ত্তন হইয়াছিল এবং ঔষধ সেবনে আমার আর বড় আস্থা ছিল না, রোগ কঠোর না হইলে প্রকৃতির সাধারণ ক্রিয়াতেই স্বাস্থ্যলাভ হইবে, এই বিশ্বাস ছিল। বর্ষার বাতাস স্পর্শে যাহা অনিষ্ট হওয়া সম্ভব, তাহা যোগবলে দমন করিয়া নিজের তর্কবুদ্ধির নিকট আমার যোগশিক্ষাগত ক্রিয়া সকলের যাথার্থ্য ও সফলতা প্রতিপাদন করিবার ইচ্ছা ছিল। ডাক্তার সাহেব কিন্তু আমার জন্য মহা চিন্তিত ছিলেন, বড় আগ্রহের সহিত তিনি হাসপাতালে যাইবার প্রয়োজনীয়তা আমাকে বুঝাইলেন। সেইস্থানে গমন করিলে যতদূর সম্ভব নিজের বাড়ীর মত থাকিবার খাইবার ব্যবস্থা করিয়া আমাকে সাদরে রাখিলেন। পাছে ওয়ার্ডে থাকিলে বর্ষার জন্য আমার স্বাস্থ্য নষ্ট হয় এইজন্য তাঁহার ইচ্ছা ছিল আমাকে অনেকদিন এই সুখে রাখেন। কিন্তু আমি জোর করিয়া ওয়ার্ডে ফিরিয়া গেলাম, আর হাসপাতালে থাকিতে অসম্মত হইলাম। তাঁহার সকলের উপর সমান অনুগ্রহ ছিল না, বিশেষতঃ যাঁহারা পুষ্টশরীর ও বলবান ছিলেন, তাঁহাদের রোগ হইলেও হাসপাতালে রাখিতে ভয় করিতেন। তাঁহার এই ভ্রান্ত ধারণা ছিল যে যদি জেলে কোনও কাণ্ড হয় তাহা সবল ও চঞ্চল বালকদের দ্বারা হইবে। শেষে ঠিক ইহার বিপরীত ফল হইল, হাসপাতালে যে কাণ্ড ঘটিল, তাহা ব্যাধিগ্রস্ত, বিশীর্ণ, শুষ্ককায় সত্যেন্দ্র নাথ বসু এবং রোগক্লিষ্ট ধীরপ্রকৃতি অল্পভাষী কানাইলাল ঘটাইলেন। ডাক্তার ডেলীর এই সকল গুণ থাকিলেও বৈদ্যনাথ বাবুই তাঁহার অধিকাংশ সৎকার্য্যের প্রবর্ত্তক ও প্রেরণাদায়ক ছিলেন। বাস্তবিক বৈদ্যনাথ বাবুর ন্যায় হৃদয়বান লোক আমি আগেও দেখি নাই, পরেও দেখিবার আশা করি না, তিনি যেন দয়া ও উপকার করিতেই জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। কোনও দুঃখ কাহিনী অবগত হওয়া এবং তাহা লাঘব করিবার জন্য ধাবিত হওয়া তাঁহার চরিত্রে যেন স্বাভাবিক কারণ ও অবশ্যম্ভাবী কার্য্য হইয়াছিল। তিনি এই যন্ত্রণাপূর্ণ দুঃখালয়ে যেন নরকের প্রাণী সকলকে স্বর্গের সযত্ন সঞ্চিত নন্দনবারি বিতরণ করিতেন। কোনও অভাব, অন্যায় বা অনর্থক কষ্ট অপনোদন করিবার শ্রেষ্ঠ উপায় ছিল তাহা ডাক্তার বাবুর কর্ণে পৌছাইয়া দেওয়া। তাহা অপনোদন করা তাঁহার ক্ষমতার ভিতরে থাকিলে তিনি সেইরূপ ব্যবস্থা করিতে ছাড়িতেন না। বৈদ্যনাথ বাবু হৃদয়ে গভীর দেশভক্তি পোষণ করিতেন কিন্তু সরকারী চাকর বলিয়া প্রাণের সেই ভাবকে চরিতার্থ করিতে অক্ষম ছিলেন। তাঁহার একমাত্র দোষ অতিরিক্ত সহানুভূতি। কিন্তু সেই ভাব জেলের কর্ম্মচারীর পক্ষে দোষ হইলেও উচ্চ নীতির অনুসারে মনুষ্যত্বের চরম বিকাশ এবং

ভগবানের প্রিয়তম গুণ বলা যায়। সাধারণ কয়েদী ও "বন্দেমাতরং" কয়েদীতে তাঁহার পক্ষে কোনও ভেদ ছিল না; পীড়িত দেখিলে সকলকেই যত্ন করিয়া হাসপাতালে রাখিতেন এবং সম্পূর্ণ শারীরিক স্বাস্থ্যলাভ না হওয়া পর্য্যন্ত ছাড়িতে ইচ্ছা করিতেন না। এই দোষই তাঁহার পদচ্যুতির প্রকৃত কারণ। গোঁসাইয়ের হত্যার পরে কর্তৃপক্ষ তাঁহার এই আচরণে সন্দেহ করিয়া তাঁহাকে অন্যায় ভাবে কর্ম্মচ্যুত করেন।

এই সকল কর্ম্মচারীদের দয়া ও মনুষ্যোচিত ব্যবহার বর্ণনা করার বিশেষ প্রয়োজন আছে। জেলে আমাদের জন্য যে ব্যবস্থা করা হইয়াছিল, ইতিপূর্ব্বে তাহার আলোচনা করিতে বাধ্য হইয়াছি এবং ইহার পরেও বৃটিশ জেলপ্রণালীর অমানুষিক নিষ্ঠুরতা প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিব। পাছে কোনও পাঠক এই নিষ্ঠুরতা কর্ম্মচারীদের চরিত্রের কুফল বলিয়া মনে করেন, সেইজন্য মুখ্য কর্ম্মচারীদের গুণ বর্ণনা করিলাম। কারাবাসের প্রথম অবস্থার বিবরণে তাঁহাদের এই সকল গুণের আরও প্রমাণ পাওয়া যাইবে।

নির্জ্জন কারাবাসে প্রথম দিনের মনের ভাব বর্ণনা করিয়াছি। এই নির্জ্জন কারাবাসে কালযাপনের উপায় স্বরূপ পুস্তক বা অন্য কোন বস্তু ব্যতীত কয়েকদিন থাকিতে হইয়াছিল। পরে এমারসন সাহেব আসিয়া আমাকে বাড়ী হইতে ধুতি জামা ও পড়িবার বই আনাইবার অনুমতি দিয়া যান। আমি কর্ম্মচারীদের নিকট কালি কলম ও জেলের ছাপান চিঠির কাগজ আনাইয়া আমার পূজনীয় মেসোমহাশয় সঞ্জীবনীর সুপ্রসিদ্ধ সম্পাদককে ধুতি জামা এবং পড়িবার বইর মধ্যে গীতা ও উপনিষদ পাঠাইতে অনুরোধ করিলাম। এই পুস্তকদ্বয় আমার হাতে পৌছিতে দুই চারি দিন লাগে। তাহার পূর্ব্বে নির্জ্জন কারাবাসের মহত্ত্ব বুঝিবার যথেষ্ট অবসর পাইয়াছিলাম। কেন এইরূপ কারাবাসে দৃঢ় ও সুপ্রতিষ্ঠিত বুদ্ধিরও ধ্বংস হয় এবং তাহা অচিরে উন্মাদ অবস্থা প্রাপ্ত হয়, তাহাও বুঝিতে পারিলাম এবং সেই অবস্থায়ই ভগবানের অসীম দয়া এবং তাঁহার সঙ্গে যুক্ত হইবার কি দুর্লভ সুবিধা হয় তাহাও হৃদয়ঙ্গম হইল। কারাবাসের পূর্ব্বে আমার সকালে এক ঘন্টা ও সন্ধ্যাবেলায় এক ঘন্টা ধ্যান করিবার অভ্যাস ছিল। এই নির্জ্জন কারাবাসে আর কোনও কার্য্য না থাকায় অধিককাল ধ্যানে থাকিবার চেষ্টা করিলাম। কিন্তু মানুষের সহস্র-পথ-ধাবিত চঞ্চল মনকে ধ্যানার্থে অনেকটা সংযত ও এক লক্ষ্যগত রাখা অনভ্যস্ত লোকের পক্ষে সহজ নয়। কোনও মতে দেড়ঘন্টা দুইঘন্টা একভাবে রাখিতে পারিতাম, শেষে মন বিদ্রোহী হইয়া উঠিত, দেহও অবসন্ন হইয়া পড়িত। প্রথম নানা চিন্তা লইয়া থাকিতাম। তাহার পরে সেই মানুষের আলাপরহিত চিন্তার বিষয়শূন্য অসহনীয় অকর্ম্মণ্যতায় মন ধীরে ধীরে চিন্তাশক্তি রহিত হইতে লাগিল। এমন অবস্থা হইতে লাগিল যেন সহস্র অস্পষ্ট চিন্তা মনের দ্বার সকলের চারিদিকে ঘুরিতেছে অথচ প্রবেশ পথ নিরুদ্ধ; দুয়েকটি প্রবেশ করিতে সমর্থ হইয়াও সেই নিস্তব্ধ মনোরাজ্যের

নীরবতায় ভীত হইয়া নিঃশব্দে পলায়ন করিতেছে। এই অনিশ্চিত অবশ অবস্থায় অতিশয় মানসিক কষ্ট পাইতে লাগিলাম। প্রকৃতির শোভায় চিত্ত-বৃত্তি স্নিগ্ধ হইবার এবং তপ্ত মন সান্ত্বনা পাইবার আশায় বাহিরে চাহিয়া দেখিলাম, কিন্তু সেই একমাত্র বৃক্ষ, নীল আকাশের পরিমিত খণ্ডটুকু এবং সেই জেলের নিরানন্দ দৃশ্যে কতক্ষণ মানুষের এই অবস্থাপ্রাপ্ত মন সান্ত্বনা লাভ করিতে পারে? দেওয়ালের দিকে চাহিলাম। জেলের ঘরের সেই নির্জীব সাদা দেওয়াল দর্শনে যেন মন আরও নিরুপায় হইয়া কেবল বদ্ধাবস্থার যন্ত্রণাই উপলব্ধি করিয়া মস্তিষ্ক পিঞ্জরে ছটফট করিতে লাগিল। আবার ধ্যানে বসিলাম, ধ্যান কিছুতেই হইল না বরং সেই তীব্র বিফল চেষ্টায় মন আরও শ্রান্ত, অকর্ম্মণ্য ও দগ্ধ হইতে লাগিল। চারিদিকে চাহিয়া দেখিলাম, শেষে মাটিতে কয়েকটি বড় বড় কাল পিপীলিকা গর্ত্তের নিকট বেড়াইতেছে দেখিলাম, তাহাদের গতিবিধি ও চেষ্টা চরিত্র নিরীক্ষণ করিতে সময় কাটিয়া গেল। তাহার পরে দেখিলাম ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লাল পিপীলিকা বেড়াইতেছে। কালতে লালেতে বড় ঝগড়া, কালগুলি লালকে পাইয়া দংশন করিতে করিতে প্রাণবধ করিতে লাগিল। অত্যাচার পীড়িত লাল পিপীলিকার উপর বড় দয়া ও সহানুভূতি হইল। আমি কালগুলিকে তাড়াইয়া তাহাদের বাঁচাইতে লাগিলাম। ইহাতে একটি কার্য্য জুটিল, চিন্তার বিষয়ও পাওয়া গেল, পিপীলিকাগুলির সাহায্যে এই কয়েকদিন কাটান গেল। তথাপি দীর্ঘ দিনার্দ্ধ যাপন করিবার উপায় আর জুটিতেছিল না। মনকে বুঝাইয়া দিলাম, জোর করিয়া চিন্তা আনিলাম, কিন্তু দিন দিন মন বিদ্রোহী হইতে লাগিল, হাহাকার করিতে লাগিল। কাল যেন তাহার উপর অসহ্য ভার হইয়া পীড়ন করিতেছে, সেই চাপে চূর্ণ হইয়া সে হাঁপ ছাড়িবার শক্তিও পাইতেছে না, যেন স্বপ্নে শত্রুদ্বারা আক্রান্ত ব্যক্তি গলাপীড়নে মরিয়া যাইতেছে অথচ হাত পা থাকিয়াও নড়িবার শক্তি রহিত। আমি এই অবস্থা দেখিয়া আশ্চর্য্য হইলাম! সত্য বটে, আমি কখন অকর্ম্মণ্য বা নিশ্চেষ্ট হইয়া থাকিতে ভালবাসি নাই, তবে কতবার একাকী থাকিয়া চিন্তায় কালযাপন করিয়াছি, এক্ষণে এতই কি মনের দুর্ব্বলতা হইয়াছে যে অল্পদিনের নির্জ্জনতায় এত আকুল হইয়া পড়িতেছি? ভাবিতে লাগিলাম, হয়ত সেই স্বেচ্ছাপ্রাপ্ত নির্জ্জনতা ও এই পরেচ্ছাপ্রাপ্ত নির্জ্জনতায় অনেক প্রভেদ আছে। বাড়ীতে বসিয়া একাকী থাকা এক কথা, আর পরের ইচ্ছায় কারাগৃহে এই নির্জ্জনবাস স্বতন্ত্র কথা। সেখানে যখন ইচ্ছা হয় মানুষের আশ্রয় লইতে পারি, পুস্তকগত জ্ঞান ও ভাষালালিত্যে, বন্ধু-বান্ধবের প্রিয় সম্ভাষণে, রাস্তার কোলাহলে, জগতের বিবিধ দৃশ্যে মনের তৃপ্তি সাধন করিয়া প্রাণকে শীতল করিতে পারি। কিন্তু এখানে কঠিন নিয়মে আবদ্ধ হইয়া পরের ইচ্ছায় সর্ব্বসংস্রব রহিত হইয়া থাকিতে হইবে। কথা আছে, যে নির্জ্জনতা সহ্য করিতে পারে, সে হয় দেবতা নয় পশু, এই সংযম মানুষের সাধ্যাতীত। সেই কথায় আমি আগে বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারিতাম না, এখন বুঝিলাম

সত্য সত্যই যোগাভ্যস্ত সাধকেরও এই সংযম সহজসাধ্য নয়। ইতালীর রাজহত্যাকারী ব্রেশীর ভীষণ পরিণাম মনে পড়িল। তাঁহার নিষ্ঠুর বিচারকগণ তাঁহাকে প্রাণে না মারিয়া সপ্ত বৎসরের নির্জ্জন কারাবাসে দণ্ডিত করিয়াছিলেন। এক বৎসরও অতিবাহিত না হইতেই ব্রেশী উন্মাদাবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তবে এতদিন সহ্য করিলেন ত! আমার মনের দৃঢ়তা কি এতই কম? তখন বুঝিতে পারি নাই যে ভগবান আমার সহিত খেলা করিতেছেন, ক্রীড়াচ্ছলে আমাকে কয়েকটি প্রয়োজনীয় শিক্ষা দিতেছেন। প্রথমতঃ, কিরূপ মনের গতিতে নির্জ্জন কারাবাসের কয়েদী উন্মত্ততার দিকে ধাবিত হয়, তিনি তাহা দেখাইয়া এইরূপ কারাবাসের অমানুষিক নিষ্ঠুরতা বুঝাইয়া আমাকে য়ুরোপীয় জেলপ্রণালীর ঘোর বিরোধী করিলেন, এবং যাহাতে আমার সাধ্যমত আমি দেশের লোককে ও জগৎকে এই বর্ব্বরতা হইতে ফিরাইয়া দয়ানুমোদিত জেলপ্রণালীর পক্ষপাতী করিবার চেষ্টা করি তিনি সেই শিক্ষা আমাকে দিলেন। মনে পড়ে, আমি পনের বৎসর আগে বিলাত হইতে দেশে আসিয়া যখন বোম্বাই হইতে প্রকাশিত ইন্দুপ্রকাশ পত্রিকায় কংগ্রেসের নিবেদন-নীতির তীব্র প্রতিবাদপূর্ণ প্রবন্ধ লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলাম, তখন স্বর্গগত মহাদেব গোবিন্দ রাণাডে যুবকদের মনে এই প্রবন্ধগুলির ফল হইতেছে দেখিয়া তাহা বন্ধ করিবার উদ্দেশ্যে আমি তাঁহার সহিত দেখা করিতে যাইবামাত্র আমাকে আধঘন্টা পর্য্যন্ত এই কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া কংগ্রেসের কোনও কার্য্যভার গ্রহণ করিতে উপদেশ দেন। তিনি আমার উপর জেলপ্রণালী সংশোধনের ভার দিতে ইচ্ছুক হইয়াছিলেন। রাণাডের এই অপ্রত্যাশিত উক্তিতে আমি আশ্চর্য্যান্বিত ও অসন্তুষ্ট হইয়াছিলাম, এবং সেই ভার গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিয়াছিলাম। তখন জানিতাম না যে ইহা সুদূর ভবিষ্যতের পূর্ব্বাভাস মাত্র এবং একদিন স্বয়ং ভগবান আমাকে জেলে একবৎসর কাল রাখিয়া সেই প্রণালীর ক্রূরতা ও ব্যর্থতা এবং সংশোধনের প্রয়োজনীয়তা বুঝাইবেন। এক্ষণে বুঝিলাম অদ্যকার রাজনৈতিক অবস্থায় এই জেলপ্রণালীর সংশোধনের সম্ভাবনা নাই, তবে স্ব-অধিকার প্রাপ্ত ভারতে যাহাতে বিদেশী সভ্যতার এই নারকীয় অংশ গৃহীত না হয়, তাহা প্রচার করিতে ও তৎসম্বন্ধে যুক্তি দেখাইতে জেলে বসিয়া আমার অন্তরাত্মার নিকট প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলাম। ভগবানের দ্বিতীয় অভিসন্ধি বুঝিলাম, আমার মনের এই দুর্ব্বলতা মনের সম্মুখে তুলিয়া তাহা চিরকালের জন্য বিনাশ করা। যে যোগাবস্থাপ্রার্থী তাহার পক্ষে জনতা ও নির্জ্জনতা সমান হওয়া উচিত। বাস্তবিক অতি অল্পদিনের মধ্যে এই দুর্ব্বলতা ঘুচিয়া গেল, এখন বোধ হয় দশ বৎসর একাকী থাকিলেও মন টলিবে না। মঙ্গলময় অমঙ্গল দ্বারাও পরম মঙ্গল ঘটান। তৃতীয় অভিসন্ধি, আমাকে এই শিক্ষা দেওয়া যে আমার যোগাভ্যাস স্বচেষ্টায় কিছু হইবে না, শ্রদ্ধা ও সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণই সিদ্ধিলাভের পন্থা, ভগবান স্বয়ং প্রসন্ন হইয়া যে শক্তি সিদ্ধি বা আনন্দ দিবেন, তাহাই গ্রহণ করিয়া তাঁহার কার্য্যে

লাগান আমার যোগলিপ্সার একমাত্র উদ্দেশ্য। যেদিন হইতে অজ্ঞানের প্রগাঢ় অন্ধকার লঘীভূত হইতে লাগিল, সেদিন হইতে আমি জগতের ঘটনা-সকল নিরীক্ষণ করিতে করিতে মঙ্গলময় শ্রীহরির আশ্চর্য্য অনন্ত মঙ্গল স্বরূপত্ব উপলব্ধি করিতেছি। এমন ঘটনা নাই,--সেই ঘটনা মহান্ হৌক বা ক্ষুদ্র হইতে ক্ষুদ্রতম হৌক,--যাহার দ্বারা কোনও মঙ্গল সম্পাদিত হয় না। প্রায়ই তিনি এক কার্য্য দ্বারা দুই চারি উদ্দেশ্য সিদ্ধ করেন। আমরা জগতে অনেকবার অন্ধশক্তির খেলা দেখি, অপব্যয়ই প্রকৃতির নিয়ম বলিয়া ভগবানের সর্ব্বজ্ঞতাকে অস্বীকার করিয়া ঐশ্বরিক বুদ্ধির দোষ দিই। সে অভিযোগ অমূলক। ঐশী শক্তি কখনও অন্ধ ভাবে কার্য্য করেন না, তাঁহার শক্তির বিন্দুমাত্র অপব্যয় হইতে পারে না, বরং তিনি এমন সংযত ভাবে অল্প ব্যয়ে বহু ফল উৎপাদন করেন যে তাহা মানুষের কল্পনার অতীত।

এইরূপ ভাবে মনের নিশ্চেষ্টতায় পীড়িত হইয়া কয়েক দিন কষ্টে কাল-যাপন করিলাম। একদিন অপরাহ্নে আমি চিন্তা করিতেছিলাম, চিন্তা আসিতেই লাগিল, হঠাৎ সেই চিন্তা সকল এমন অসংযত ও অসংলগ্ন হইতে লাগিল যে বুঝিতে পারিলাম চিন্তার উপর বুদ্ধির নিগ্রহশক্তি লুপ্ত হইতে চলিল। তাহার পরে যখন প্রকৃতিস্থ হইলাম ,তখন মনে পড়িল যে বুদ্ধির নিগ্রহশক্তি লুপ্ত হইলেও বুদ্ধি স্বয়ং লুপ্ত বা এক মুহূর্ত্ত ভ্রষ্ট হয় নাই, বরং শান্তভাবে মনের এই অপূর্ব্ব ক্রিয়া যেন নিরীক্ষণ করিতেছিল। কিন্তু তখন আমি উন্মত্ততা-ভয়ে ত্রস্ত হইয়া ইহা লক্ষ্য করিতে পারি নাই। প্রাণপণে ভগবানকে ডাকিলাম, আমার বুদ্ধিভ্রংশ নিবারণ করিতে বলিলাম। সেই মুহূর্ত্তে আমার সমস্ত অন্তঃ-করণে হঠাৎ এমন শান্তি প্রসারিত হইল, সমস্ত শরীরময় এমন শীতলতা ব্যাপ্ত হইতে লাগিল, উত্তপ্ত মন এমন স্নিগ্ধ, প্রসন্ন ও পরম সুখী হইল যে পূর্ব্বে এই জীবনে এমন সুখময় অবস্থা অনুভব করিতে পারি নাই। শিশু মাতৃক্রোড়ে যেমন আশ্বস্ত ও নির্ভীক হইয়া শুইয়া থাকে আমিও যেন বিশ্বজননীর ক্রোড়ে সেইরূপ শুইয়া রহিলাম। এই দিনেই আমার কারাবাসের কষ্ট ঘুচিয়া গেল। ইহার পরে কয়েকবার বদ্ধাবস্থার অশান্তি, নির্জ্জন কারাবাস ও কর্ম্মহীনতায় মনের অসো-য়াস্তি , শারীরিক ক্লেশ বা ব্যাধি , যোগান্তর্গত কাতর অবস্থা ঘটিয়াছে , কিন্তু সে দিনে ভগবান এক মুহূর্ত্তে অন্তরাত্মায় এমন শক্তি দিলেন যে এই সকল দুঃখ মনে আসিয়া ও মন হইতে চলিয়া যাইবার পরে কোন দাগ বা চিহ্ন রাখিতে পারিত না, দুঃখের মধ্যেই বল ও আনন্দ উপভোগ করিয়া বুদ্ধি মনের দুঃখকে প্রত্যাখ্যান করিতে সক্ষম হইত। সেই দুঃখ পদ্মপত্রে জলবিন্দুবৎ বোধ হইত। তাহার পরে যখন পুস্তক আসিল, তখন তাহার প্রয়োজনীয়তা অনেক কমিয়া গিয়াছিল। বই না আসিলেও আমি থাকিতে পারিতাম। যদিও আমার আন্তরিক জীবনের ইতিহাস লেখা এই প্রবন্ধগুলির উদ্দেশ্য নয়, তথাপি এই ঘটনা উল্লেখ না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। পরে দীর্ঘকাল নির্জ্জন কারাবাসে কেমন করিয়া আনন্দে থাকা সম্ভব হইল, তাহা এই ঘটনা হইতেই বোঝা যাইবে।

এই কারণেই ভগবান সেই অবস্থা ঘটাইয়াছিলেন। তিনি উন্মত্ততা না ঘটাইয়া নির্জ্জন কারাবাসে উন্মত্ততার ক্রমবিকাশের প্রণালী আমার মনের মধ্যে অভিনয় করাইয়া বুদ্ধিকে সেই নাটকের অবিচলিত দর্শকরূপে বসাইয়া রাখিলেন। তাহাতে আমি শক্তি পাইলাম, মানুষের নিষ্ঠুরতায় অত্যাচার-পীড়িত ব্যক্তিদের উপর দয়া ও সহানুভূতি বাড়িল এবং প্রার্থনার অসাধারণ শক্তি ও সফলতা হৃদয়ঙ্গম করিলাম।

আমার নির্জ্জন কারাবাসের সময় ডাক্তার ডেলী ও সহকারী সুপারিন্টেণ্ডেন্ট সাহেব প্রায় রোজ আমার ঘরে আসিয়া দুই চারিটি গল্প করিয়া যাইতেন। জানি না কেন, আমি প্রথম হইতে তাঁহাদের বিশেষ অনুগ্রহ ও সহানুভূতি লাভ করিতে পারিয়াছিলাম । আমি উঁহাদের সহিত বিশেষ কোন কথা কহিতাম না, তাঁহারা যাহা জিজ্ঞাসা করিতেন, তাহার উত্তর দিতাম। যে বিষয় উত্থাপন করিতেন, তাহা হয় নীরবে শুনিতাম, না হয় দু' একটি সামান্য কথা মাত্র বলিয়া ক্ষান্ত হইতাম। তথাপি তাঁহারা আমার নিকট আসিতে ছাড়িতেন না। একদিন ডেলী সাহেব আমাকে বলিলেন, আমি সহকারী সুপারিন্টেণ্ডেন্টকে বলিয়া বড় সাহেবকে সম্মত করাইতে পারিয়াছি যে তুমি প্রত্যহ সকালে ও বিকালে ডিক্রীর সামনে বেড়াইতে পারিবে। তুমি যে সমস্ত দিন এক ক্ষুদ্র কুঠ্‌রীতে আবদ্ধ হইয়া থাকিবে, ইহা আমার ভাল লাগে না, ইহাতে মন খারাপ হয় এবং শরীরও খারাপ হয়। সেই দিন হইতে আমি সকালে বিকালে ডিক্রীর সম্মুখে খোলা জায়গায় বেড়াইতাম। বিকালে দশ মিনিট, পনর মিনিট, কুড়ি মিনিট বেড়াইতাম, কিন্তু সকালে এক ঘন্টা, এক একদিন দুই ঘন্টা পর্য্যন্ত বাহিরে থাকিতাম, সময়ের কোনও নিয়ম ছিল না। এই সময় বড় ভাল লাগিত। একদিকে জেলের কারখানা, অপরদিকে গোয়াল ঘর––আমার স্বাধীন রাজ্যের এই দুই সীমা ছিল। কারখানা হইতে গোয়াল ঘর, গোয়াল ঘর হইতে কারখানা, ইতস্ততঃ বিচরণ করিতে করিতে হয় উপনিষদের গভীর ভাবোদ্দীপক অক্ষয় শক্তিদায়ক মন্ত্র সকল আবৃত্তি করিতাম, না হয় কয়েদীদের কার্য্যকলাপ ও যাতায়াত লক্ষ্য করিয়া সর্ব্বঘটে নারায়ণ এই মূল সত্য উপলব্ধি করিবার চেষ্টা করিতাম। বৃক্ষে, গৃহে, প্রাচীরে, মনুষ্যে, পশুতে, পক্ষীতে, ধাতুতে, মৃত্তিকায় সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম মনে মনে এই মন্ত্রোচ্চারণপূর্ব্বক সর্ব্বভূতে সেই উপলব্ধি আরোপ করিতাম। এইরূপ করিতে করিতে এমন ভাব হইয়া যাইত যে, কারাগার আর কারাগারই বোধ হইত না। সেই উচ্চ প্রাচীর, সেই লোহার গরাদ, সেই সাদা দেওয়াল, সেই সূর্য্যরশ্মিদীপ্ত নীলপত্রশোভিত বৃক্ষ, সেই সামান্য জিনিসপত্র যেন আর অচেতন নহে, যেন সর্ব্বব্যাপী চৈতন্যপূর্ণ হইয়া সজীব হইয়াছে, তাহারা আমাকে ভালবাসে, আমাকে আলিঙ্গন করিতে চায় এইরূপ বোধ হইত। মনুষ্য, গাভী, পিপীলিকা, বিহঙ্গ চলিতেছে, উড়িতেছে,

গাহিতেছে, কথা বলিতেছে, অথচ সবই প্রকৃতির ক্রীড়া; ভিতরে এক মহান্ নিৰ্ম্মল নির্লিপ্ত আত্মা শান্তিময় আনন্দে নিমগ্ন হইয়া রহিয়াছেন। এক এক-বার এমন বোধ হইত যেন ভগবান সেই বৃক্ষতলে আনন্দের বংশী বাজাইতে দাঁড়াইয়াছেন; এবং সেই মাধুর্য্যে আমার হৃদয় টানিয়া বাহির করিতেছেন। সৰ্ব্বদা বোধ হইতে লাগিল, যেন কে আমাকে আলিঙ্গন করিতেছে, কে আমাকে কোলে করিয়া রহিয়াছে। এই ভাববিকাশে আমার সমস্ত মনপ্রাণ অধিকার করিয়া কি এক নিৰ্ম্মল মহতী শান্তি বিরাজ করিতে লাগিল, তাহার বর্ণনা করা যায় না। প্রাণের কঠিন আবরণ খুলিয়া গেল এবং সৰ্ব্বজীবের উপর প্রেমের স্রোত বহিতে লাগিল। প্রেমের সহিত দয়া, করুণা, অহিংসা ইত্যাদি সাত্ত্বিক ভাব আমার রজঃপ্রধান স্বভাবকে অভিভূত করিয়া বিশেষ বিকাশ লাভ করিতে লাগিল। আর যতই বিকাশ পাইতে লাগিল, ততই আনন্দ বৃদ্ধি হইল এবং নিৰ্ম্মল শান্তিভাব গভীর হইল। মোকদ্দমার দুশ্চিন্তা প্রথম হইতে দূর হইয়া গিয়াছিল, এখন বিপরীত ভাব মনে স্থান পাইল। ভগবান মঙ্গলময়, আমার মঙ্গলের জন্যই আমাকে কারাগৃহে আনিয়াছেন, নিশ্চয় কারামুক্তি ও অভিযোগখণ্ডন হইবে, এই দৃঢ় বিশ্বাস হইয়া গেল। ইহার পরে অনেক দিন আমার জেলের কোনও কষ্টভোগ করিতে হয় নাই।

এই অবস্থা ঘনীভূত হইতে কয়েক দিন লাগিল, তাহারই মধ্যে ম্যাজিষ্ট্রেটের আদালতে মোকদ্দমা আরম্ভ হয়। নির্জ্জন কারাবাসের নীরবতা হইতে হঠাৎ বহির্জ্জগতের কোলাহলের মধ্যে আনীত হইয়া প্রথম মন বড় বিচলিত হইল, সাধনার স্থৈর্য্যভঙ্গ হইল এবং সেই পাঁচ ঘন্টাকাল মোকদ্দমার নীরস ও বিরক্তিকর কথা শুনিতে মন কিছুতে সম্মত হইল না। প্রথম আদালতে বসিয়া সাধনা করিতে চেষ্টা করিতাম, কিন্তু অনভ্যস্ত মন প্রত্যেক শব্দ ও দৃশ্যের দিকে আকৃষ্ট হইত, গোলের মধ্যে সেই চেষ্টা ব্যর্থ হইত, পরে ভাবের পরিবর্ত্তন হয়, এবং সমীপবর্ত্তী শব্দ দৃশ্য মনের বহির্ভূত করিয়া সমস্ত চিন্তাশক্তি অন্তর্মুখী করিবার শক্তি জন্মাইয়াছিল, কিন্তু মোকদ্দমার প্রথম অবস্থায় তাহা ঘটে নাই, তখন ধ্যানধারণার প্রকৃত ক্ষমতা ছিল না। সেই কারণে এই বৃথা চেষ্টা পরিত্যাগ করিয়া মধ্যে মধ্যে সৰ্ব্বভূতে ঈশ্বর দর্শন করিয়া সন্তুষ্ট থাকিতাম, অবশিষ্ট সময় বিপদকালের সঙ্গীদের কথা ও তাহাদের কার্য্যকলাপ লক্ষ্য করিতাম, অন্য চিন্তা করিতাম, অথবা কখনও নর্টন সাহেবের শ্রবণ-যোগ্য কথা বা সাক্ষীর সাক্ষ্যও শুনিতাম। দেখিলাম নির্জ্জন কারাগৃহে যেমন সময় কাটান সহজ ও সুখকর হইয়া উঠিয়াছে, জনতার মধ্যে এবং সেই গুরুতর মোকদ্দমার জীবনমরণের খেলার মধ্যে সময় কাটান তেমন সহজ নয়। অভিযুক্ত বালকদের হাসি-তামাসা ও আমোদ-প্রমোদ শুনিতে ও দেখিতে বড় ভাল লাগিত, নচেৎ আদালতের সময় কেবলই বিরক্তিকর বোধ হইত। সাড়ে চারটা বাজিলে সানন্দে কয়েদীদের গাড়ীতে উঠিয়া জেলে ফিরিয়া যাইতাম।

পনের ষোল দিনের বন্দী অবস্থার পরে স্বাধীন মনুষ্য-জীবনের সংসর্গ ও

পরস্পরের মুখ দর্শনে অন্যান্য কয়েদীদের অতিশয় আনন্দ হইয়াছিল। গাড়ীতে উঠিয়াই তাহাদের হাসি ও কথার ফোয়ারা খুলিয়া যাইত এবং যে দশ মিনিটকাল তাহাদিগকে গাড়ীতে থাকিতে হইত, তাহার এক মুহূর্ত্তও সেই স্রোত থামিত না। প্রথম দিন আমাদের খুব সম্মানের সহিত আদালতে লইয়া যায়। আমাদের সঙ্গেই য়ুরোপীয়ান সার্জ্জেন্টের ক্ষুদ্র পল্টন এবং তাহাদের নিকট আবার গুলিভরা পিস্তল ছিল। গাড়ীতে উঠিবার সময় এক-দল সশস্ত্র পুলিশ আমাদিগকে ঘিরিয়া থাকিত এবং গাড়ীর পশ্চাতে কুচ-কাওয়াজ করিত, নামিবার সময়ও তদ্রূপ আয়োজন ছিল। এই সাজসজ্জা দেখিয়া কোন কোন অনভিজ্ঞ দর্শক নিশ্চয় ভাবিয়াছিলেন যে, এই হাস্যপ্রিয় অল্পবয়স্ক বালকগণ না জানি কি দুঃসাহসিক বিখ্যাত মহাযোদ্ধার দল। না জানি তাহাদের প্রাণে ও শরীরে কত সাহস ও বল যে খালি হাতে শত পুলিস ও গোরার দুর্ভেদ্য প্রাচীর ভেদ করিয়া পলায়ন করিতেও সক্ষম। সেইজন্য বোধ হয় অতি সম্মানের সহিত তাহাদিগকে এইরূপে লইয়া গেল। কয়েক দিন এইরূপ ঠাট চলিল, তাহার পর ক্রমে ক্রমে তাহা কমিতে লাগিল, শেষে দুই চারিজন সার্জ্জেন্ট আমাদের লইয়া যাইত ও লইয়া আসিত। নামিবার সময় তাহারা বড় দেখিত না, আমরা কি ভাবে জেলে ঢুকি; আমরা যেন স্বাধীন ভাবে বেড়াইয়া বাড়ীতে ফিরিয়া আসিতেছি, সেইরূপে জেলে ঢুকিতাম। এইরূপ অযত্ন ও শিথিলতা দেখিয়া পুলিস কমিশনার সাহেব ও কয়েকজন সুপারিন্টেণ্ডেন্ট চটিয়া উঠিয়া বলিয়াছিলেন, "প্রথম দিন পঁচিশ ত্রিশজন সার্জ্জেন্টের ব্যবস্থা করিয়াছিলাম, আজকাল দেখিতেছি, চার পাঁচজনও আসে না।" তাঁহারা সার্জ্জেন্টদের তিরস্কার করিতেন এবং রক্ষণাবেক্ষণের কঠোর ব্যবস্থা করিতেন, তাহার পর দুদিন হয় ত আর দুইজন সার্জ্জেন্ট আসিত, তাহার পর পূর্ব্বেকার শিথিলতা আবার আরম্ভ হইত! সার্জ্জেন্টগণ দেখিলেন যে, এই বোমার ভক্তগণ বড় নিরীহ ও শান্ত লোক, তাহাদের পলায়নের কোন উদ্যোগ নাই, কাহাকেও আক্রমণ করিবার, হত্যা করিবার মৎলবও নাই, তাঁহারা ভাবিলেন, আমরা কেন অমূল্য সময় এই বিরক্তিকর কার্য্যে নষ্ট করি। প্রথমে আদালতে ঢুকিবার ও বাহির হইবার সময় আমাদিগকে তল্লাস করিত, তাহাতে সার্জ্জেন্টদের কোমল করস্পর্শ-সুখ অনুভব করিতাম, ইহা ভিন্ন এই তল্লাসে কাহারও লাভ বা ক্ষতির সম্ভাবনা ছিল না। বেশ বোঝা গেল যে, এই তল্লাসের প্রয়োজনীয়তায় আমাদের রক্ষকদের গভীর অনাস্থা ছিল। দুই চারিদিন পরে ইহাও বন্ধ হইল। আমরা নির্ব্বিঘ্নে বই, রুটি, চিনি যাহা ইচ্ছা আদালতের ভিতরে লইয়া যাইতাম। প্রথম লুকাইয়া, তাহার পরে প্রকাশ্য ভাবে লইয়া যাইতাম। আমরা বোমা বা পিস্তল ছুঁড়িতে যাইব না, সেই বিশ্বাস তাঁহাদের শীঘ্র দূর হইল। কিন্তু দেখিলাম একমাত্র ভয় সার্জ্জেন্টদের মন হইতে বিদূরিত হয় নাই। কে জানে কাহার মনে কবে ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের মহিমান্বিত মস্তকে পাদুকা নিক্ষেপ করিবার বদ মৎলব ঢুকিবে, তাহা হইলেই

সর্ব্বনাশ। সেই জন্য জুতা লইয়া ভিতরে যাইবার সবিশেষে নিষেধ ছিল এবং সেই বিষয়ে সার্জ্জেন্টগণ সর্ব্বদা সতর্ক ছিলেন। আর কোনরূপ সাবধানতার প্রতি তাঁহাদের লক্ষ্য দেখি নাই।

মোকদ্দমার স্বরূপ একটু বিচিত্র ছিল। ম্যাজিষ্ট্রেট, কৌন্সিলী, সাক্ষী, সাক্ষ্য, Exhibits, আসামী, সকলই বিচিত্র। দিন দিন সেই সাক্ষী ও Exhibit-এর অবিরাম স্রোত, সেই কৌন্সিলীর নাটকোচিত অভিনয়, সেই বালক-স্বভাব ম্যাজিস্ট্রেটের বালকোচিত চপলতা ও লঘুতা, সেই অপূর্ব্ব আসামীদের অপূর্ব্বভাব দেখিতে দেখিতে অনেকবার এই কল্পনা মনে উদয় হইত যে আমরা বৃটিশ বিচারালয়ে না বসিয়া কোন নাটগৃহের রঙ্গমঞ্চে বা কোনো কল্পনাপূর্ণ ঔপ-ন্যাসিক রাজ্যে বসিয়া আছি। এক্ষণে সেই রাজ্যের বিচিত্র জীবসকলের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা করিতেছি।

এই নাটকের প্রধান অভিনেতা সরকার বাহাদুরের কৌন্সিলী নর্টন সাহেব ছিলেন। তিনি প্রধান অভিনেতা কেন, এই নাটকের রচয়িতা, সূত্রধর (Stage manager) এবং সাক্ষীর স্মারক (prompter) ছিলেন,--এমন বৈচিত্র্যময় প্রতিভা জগতে বিরল। কৌন্সিলী নর্টন মাদ্রাজী সাহেব, সেইজন্য বোধ হয় বঙ্গদেশীয় ব্যারিষ্টার মণ্ডলীর প্রচলিত নীতি ও ভদ্রতায় অনভ্যস্ত ও অনভিজ্ঞ। তিনি এক সময় জাতীয় মহাসভার একজন নেতা ছিলেন, সেইজন্য বোধ হয় বিরুদ্ধাচরণ বা প্রতিবাদ সহ্য করিতে অক্ষম এবং বিরুদ্ধাচারীকে শাসন করিতে অভ্যস্ত। এইরূপ প্রকৃতিকে লোকে সিংহস্বভাব বলে। নর্টন সাহেব কখন মাদ্রাজ কর্পোরেশনের সিংহ ছিলেন কি না, বলিতে পারি না, তবে আলিপুর কোর্টের সিংহ ছিলেন বটে। তাঁহার আইন-অভিজ্ঞতার গভীরতায় মুগ্ধ হওয়া কঠিন--সে যেন গ্রীষ্মকালের শীত। কিন্তু বক্তৃতার অনর্গল স্রোতে, কথার পারিপাট্যে, কথার চোটে লঘু সাক্ষ্যকে গুরু করার অদ্ভুত ক্ষমতায়, অমূলক বা অল্পমূলক উক্তির দুঃসাহসিকতায়, সাক্ষী ও জুনিয়ার ব্যারিষ্টারের উপর তম্বীতে এবং সাদাকে কালো করিবার মনোমোহিনী শক্তিতে নর্টন সাহেবের অতুলনীয় প্রতিভা দেখিলেই মুগ্ধ হইতে হইত। শ্রেষ্ঠ কৌন্সিলীর মধ্যে তিন শ্রেণী আছে,--যাঁহারা আইন-পাণ্ডিত্যে এবং যথার্থ ব্যাখ্যায় ও সূক্ষ্ম বিশ্লেষণে জজের মনে প্রতীতি জন্মাইতে পারেন, যাঁহারা চতুর ভাবে সাক্ষীর নিকট সত্য কথা বাহির করিয়া ও মোকদ্দমার বিষয়ীভূত ঘটনা ও বিবেচ্য বিষয় দক্ষতার সহিত প্রদর্শন করিয়া জজ বা জুরির মন নিজের দিকে আকর্ষণ করিতে পারেন এবং যাঁহারা কথার জোরে, বিভীষিকা প্রদর্শনে, বক্তৃতার স্রোতে সাক্ষীকে হতবুদ্ধি করিয়া, মোকদ্দমার বিষয়ের দিব্য গোলমাল করিয়া, গলার জোরে জজ বা জুরীর বুদ্ধি স্থানচ্যুত করিয়া মোকদ্দমায় জিতিতে পারেন। নর্টন সাহেব তৃতীয় শ্রেণীর মধ্যে অগ্রগণ্য। ইহা দোষের কথা নহে। কৌন্সিলী ব্যবসায়ী মানুষ, টাকা নেন, যে টাকা দেয় তাহার অভিপ্সীত উদ্দেশ্য সিদ্ধ

করা তাঁহার কর্ত্তব্য কর্ম্ম। এখন বৃটিশ আইন প্রণালী দ্বারা সত্য কথা বাহির করা বাদী প্রতিবাদীর আসল উদ্দেশ্য নহে, কোনও উপায়ে মোকদ্দমায় জয় লাভ করাই উদ্দেশ্য। অতএব কৌন্সিলী সেই চেষ্টা করিবেন, নচেৎ তাঁহাকে ধর্ম্মচ্যুত হইতে হয়। ভগবান অন্য গুণ না দিয়া থাকিলে যে গুণ আছে, তাহার জোরেই মোকদ্দমায় জিতিতে হইবে, সুতরাং নর্টন সাহেব স্বধর্ম্ম পালনই করিতেছিলেন। সরকার বাহাদুর তাঁহাকে রোজ হাজার টাকা দিতেন। এই অর্থব্যয় বৃথা হইলে সরকার বাহাদুরের ক্ষতি হয়, সে ক্ষতি যাহাতে না হয় নর্টন সাহেব প্রাণপণে সেই চেষ্টা করিয়াছেন। তবে যে মোকদ্দমা রাজনীতি সংক্রান্ত, তাহাতে বিশেষ উদার ভাবে আসামীকে সুবিধা দেওয়া এবং সন্দেহ-জনক বা অনিশ্চিত প্রমাণের উপর জোর না করা বৃটিশ আইন পদ্ধতির নিয়ম। নর্টন সাহেব যদি এই নিয়ম সর্ব্বদা স্মরণ করিতেন তবে আমার বোধ হয় না তাঁহার কেসের কোন হানি হইত। অপর দিকে কয়েকজন নির্দ্দোষী লোককে নির্জ্জন কারাবাসের যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইত না এবং নিরীহ অশোক নন্দী প্রাণে বাঁচিতেও পারিতেন। কৌন্সিলী সাহেবের সিংহপ্রকৃতি বোধ হয় এই দোষের মূল। হলিংশেদ হল ও প্লুটার্ক যেমন সেক্সপিয়রের জন্য ঐতিহাসিক নাটকের উপাদান সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছিলেন, পুলিস তেমনি এই মোকদ্দমা নাটকের উপাদান সংগ্রহ করিয়াছিল। আমাদের নাটকের সেক্সপিয়র ছিলেন, নর্টন সাহেব। তবে সেক্সপিয়রে নর্টনে এক প্রভেদ দেখিয়াছিলাম। সেক্সপিয়র সংগৃহীত উপাদানের কয়েক অংশ মাঝে মাঝে ছাড়িয়াও দিতেন, নর্টন সাহেব ভাল মন্দ সত্য মিথ্যা সংলগ্ন অসংলগ্ন অণোঃ অণীয়ান্, মহতো মহীয়ান যাহা পাইতেন একটিও ছাড়েন নাই, তাহার উপর স্বয়ং কল্পনাসৃষ্ট প্রচুর suggestion, inference, hypothesis যোগাড় করিয়া এমন সুন্দর plot রচনা করিয়াছিলেন যে সেক্সপিয়র, ডেফো ইত্যাদি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবি ও উপন্যাস লেখক এই মহাপ্রভুর নিকট পরাজিত হইলেন। নিন্দুক বলিতে পারেন যে যেমন ফলষ্টাফের হোটেলের হিসাবে এক আনা খাদ্য ও অসংখ্য গ্যালন মদ্যের সমাবেশ ছিল, তেমনই নর্টনের plot-এ এক রতি প্রমাণের সঙ্গে দশমন অনুমান ও suggestion ছিল। কিন্তু নিন্দুকও plot-এর পারিপাট্য ও রচনাকৌশল প্রশংসা করিতে বাধ্য। নর্টন সাহেব এই নাটকের নায়করূপে আমাকেই পছন্দ করিয়াছিলেন দেখিয়া আমি সমধিক প্রীতিলাভ করিয়াছিলাম। যেমন মিল্টনের Paradise Lost -এর সয়তান, আমিও তেমনি নর্টন সাহেবের plot-এর কল্পনাপ্রসূত মহাবিদ্রোহের কেন্দ্র-স্বরূপ অসাধারণ তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন ক্ষমতাবান ও প্রতাপশালী bold bad man। আমিই জাতীয় আন্দোলনের আদি ও অন্ত, স্রষ্টা, পাতা ও বৃটিশ সাম্রাজ্যের সংহারপ্রয়াসী। উৎকৃষ্ট ও তেজস্বী ইংরাজী লেখা দেখিবামাত্র নর্টন লাফাইয়া উঠিতেন ও উচ্চৈঃস্বরে বলিতেন, অরবিন্দ ঘোষ। আন্দোলনের বৈধ অবৈধ যত সুশৃঙ্খলিত অঙ্গ বা অপ্রত্যাশিত ফল সকলই অরবিন্দ ঘোষের

সৃষ্টি, এবং যখন অরবিন্দের সৃষ্টি তখন বৈধ হইলেও নিশ্চয় অবৈধ অভিসন্ধি গুপ্তভাবে তাহার মধ্যে নিহিত। তাঁহার বোধ হয় বিশ্বাস ছিল যে আমি ধরা না পড়িলে বোধ হয় দুই বৎসরের মধ্যে ইংরাজের ভারত সাম্রাজ্য ধ্বংসপ্রাপ্ত হইত। আমার নাম কোনও ছেঁড়া কাগজের টুকরায় পাইলে নর্টন মহা খুসি হইতেন, এবং সাদরে এই পরম মূল্যবান প্রমাণ ম্যাজিষ্ট্রেটের শ্রীচরণে অর্পণ করিতেন। দুঃখের কথা, আমি অবতার হইয়া জন্মগ্রহণ করি নাই, নচেৎ আমার প্রতি সেই সময়ের এত ভক্তি ও অনবরত আমার ধ্যানে নর্টন সাহেব নিশ্চয় তখনই মুক্তিলাভ করিতেন, তাহা হইলে আমাদের কারাবাসের সময় ও গবর্ণমেন্টের অর্থব্যয় উভয়ই সঙ্কুচিত হইত। সেশন্‌স্ আদালতে আমি নির্দ্দোষী প্রমাণিত হওয়ায় নর্টন কৃত plot -এর শ্রী ও গৌরব বিনষ্ট হয়। বেরসিক বীচক্রফ্‌ট হ্যামলেট নাটক হইতে হ্যামলেটকে বাদ দিয়া বিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ কাব্যকে হতশ্রী করিয়া গেলেন। সমালোচককে যদি কাব্য পরিবর্ত্তন করিবার অধিকার দেওয়া হয়, তাহা হইলে এইরূপ দুর্দ্দশা হইবে না কেন? নর্টন সাহেবের আর এক দুঃখ ছিল যে, কয়েক জন সাক্ষীও এইরূপ বেরসিক ছিল যে, তাঁহার রচিত plot -এর অনুযায়ী সাক্ষ্য দিতে তাহারা সম্পূর্ণ অসম্মত হইয়াছিল। নর্টন সাহেব ইহাতে চটিয়া লাল হইতেন, সিংহ গর্জ্জনে সাক্ষীর প্রাণ বিকম্পিত করিয়া তাহাকে শাসাইয়া দিতেন। স্বরচিত কথার অন্যথা প্রকাশে কবির এবং স্বদত্ত শিক্ষা-বিরুদ্ধে অভিনেতার আবৃত্তি, স্বর বা অঙ্গ-ভঙ্গীতে নাটকের সূত্রধরের যে ন্যায়সঙ্গত ও অদমনীয় ক্রোধ হয়, নর্টন সাহেবের সেই ক্রোধ হইত। ব্যারিষ্টার ভুবন চাটার্জীর সহিত তাঁহার যে সংঘর্ষ হইয়াছিল, এই সাত্ত্বিক ক্রোধই তাহার কারণ। চাটার্জী মহাশয়ের ন্যায় এরূপ রসানভিজ্ঞ লোক ত দেখি নাই। তাঁহার সময় অসময় জ্ঞান আদবে ছিল না। নর্টন সাহেব যখন সংলগ্ন অসংলগ্নের বিচারকে জলাঞ্জলি দিয়া কেবল কবিত্বের খাতিরে যে সে প্রমাণ ঢুকাইয়া দিতেছিলেন, তখন চাটার্জী মহাশয় উঠিয়া অসংলগ্ন বা inadmissible বলিয়া আপত্তি করিতেন। তিনি বুঝিতে পারেন নাই যে সংলগ্ন বা আইনসঙ্গত প্রমাণ বলিয়া নয়, নর্টন কৃত নাটকের উপযোগী হইতে পারে বলিয়া সেই সাক্ষ্যগুলি রুজু হইতেছে। এই অসঙ্গত ব্যবহারে নর্টন কেন, বালি সাহেব পর্য্যন্ত চটিয়া উঠিতেন। একবার বালি সাহেব চাটার্জী মহাশয়কে করুণ স্বরে বলিয়াছিলেন, 'Mr. Chatterji, we were getting on very nicely before you came' "আপনি যখন আসেন নাই, আমরা নির্ব্বিঘ্নে মোকদ্দমা চালাইতেছিলাম।" তাহা বটে, নাটকের রচনার সময়ে কথায় কথায় আপত্তি তুলিলে নাটকও অগ্রসর হয় না, দর্শকবৃন্দেরও রসভঙ্গ হয়।

নর্টন সাহেব যদি নাটকের রচয়িতা, প্রধান অভিনেতা ও সূত্রধর হন, ম্যাজিষ্ট্রেট বালিকে নাট্যকারের পৃষ্ঠপোষক বা Patron বলিয়া অভিহিত করা যায়। বালি সাহেব বোধ হয়, স্কচ জাতির গৌরব। তাঁহার চেহারা

স্কটলণ্ডের স্মারকচিহ্ন। অতি সাদা, অতি লম্বা, অতি রোগা, দীর্ঘ দেহ-যষ্টির উপর ক্ষুদ্র মস্তক দেখিয়া মনে হইত যেন অভ্রভেদী অক্‌টারলোনী মনুমেন্টের উপর ক্ষুদ্র অক্‌টারলোনী বসিয়া আছেন, বা ক্লিয়পাত্রার obelisk এর চূড়ায় একটি পাকা নারিকেল বসান রহিয়াছে। তাঁহার চুল ধূলার বর্ণ (sandy haired) এবং স্কটলণ্ডের সমস্ত হিম ও বরফ তাঁহার মুখের ভাবে জমিয়া রহিয়াছে। যাঁহার এত দীর্ঘ দেহ, তাঁহার বুদ্ধিও তদ্রূপ হওয়া চাই, নচেৎ প্রকৃতির মিতব্যয়িতা সম্বন্ধে সন্দেহের উদ্রেক হয়। কিন্তু এই বিষয়ে বার্লি-সৃষ্টির সময়ে প্রকৃতি দেবী বোধ হয় একটু অমনোযোগী ও অন্যমনস্ক হইয়াছিলেন। ইংরাজ কবি মারলো এই মিতব্যয়িতা infinite riches in a little room (ক্ষুদ্র ভাণ্ডারে অসীম ধন) বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, কিন্তু বার্লি দর্শনে কবির বর্ণনার বিপরীত ভাব মনে উদয় হয়, infinite room-এ little riches। বাস্তবিক এই দীর্ঘ দেহে এত অল্প বিদ্যাবুদ্ধি দেখিয়া দুঃখ হইত এবং এই ধরণের অল্পসংখ্যক শাসনকর্ত্তা দ্বারা ত্রিশ কোটি ভারতবাসী শাসিত হইয়া রহিয়াছে স্মরণ করিয়া ইংরাজের মহিমা ও ব্রিটিশ শাসনপ্রণালীর উপর প্রগাঢ় ভক্তির উদয় হইত। বার্লি সাহেবের বিদ্যা শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ চক্রবর্ত্তীর জেরার সময় প্রকাশ হইয়াছিল। স্বয়ং কবে মোকদ্দমা স্বীয় করকমলে গ্রহণ করিয়াছিলেন বা কি করিয়া মোকদ্দমা গ্রহণ সম্পন্ন হয়, এত বৎসরের ম্যাজিষ্ট্রেটগিরির পরে তাহা নির্ণয় করিতে গিয়া বার্লির মাথা ঘুরিয়া গিয়াছিল, সেই সমস্যার মীমাংসায় অসমর্থ হইয়া চক্রবর্ত্তী সাহেবের উপর সেই ভার দিয়া সাহেব নিষ্কৃতি পাইতে সচেষ্ট হইয়াছিলেন। এখনও বার্লি কবে মোকদ্দমা গ্রহণ করিলেন, এই প্রশ্ন মোকদ্দমার অতি জটিল সমস্যার মধ্যে গণ্য। চাটার্জী মহাশয়ের নিকট যে করুণ নিবেদনের উল্লেখ করিলাম, তাহাতেও সাহেবের বিচার প্রণালীর কতকটা অনুমান করা যায়। প্রথম হইতে তিনি নর্টন সাহেবের পাণ্ডিত্য ও বাগ্মিতায় মন্ত্রমুগ্ধবৎ হইয়া তাঁহার বশ হইয়াছিলেন। এমন বিনীত-ভাবে নর্টনের প্রদর্শিত পথ অনুসরণ করিতেন, নর্টনের মতে মত দিতেন, নর্টনের হাসিতে হাসিতেন, নর্টনের রাগে রাগিতেন যে, এই সরল শিশুর আচরণ দেখিয়া মাঝে মাঝে প্রবল স্নেহ ও বাৎসল্য ভাব মনে আবির্ভূত হইত। বার্লি নিতান্ত বালকস্বভাব। কখন তাঁহাকে ম্যাজিষ্ট্রেট বলিয়া ভাবিতে পারি নাই, বোধ হইত যেন স্কুলের ছাত্র হঠাৎ স্কুলের শিক্ষক হইয়া শিক্ষকের উচ্চ মঞ্চে আসীন হইয়াছেন। সেই ভাবে তিনি কোর্টের কার্য্য চালাইতেন। কেহ তাঁহার প্রতি অপ্রিয় ব্যবহার করিলে স্কুলের শিক্ষকের ন্যায় শাসন করিতেন। আমাদের মধ্যে যদি কেহ কেহ মোকদ্দমা প্রহসনে বিরক্ত হইয়া পরস্পরে কথাবার্ত্তা আরম্ভ করিতেন, বার্লি সাহেব স্কুলমাষ্টারী ধরণে বকিয়া উঠিতেন, না শুনিলে সকলকে দাঁড়াইবার হুকুম করিতেন, তাহাও তৎক্ষণাৎ না শুনিলে প্রহরীকে দাঁড় করাইতে বলিতেন। আমরা এই স্কুলমাস্টারী ধরণ প্রত্যক্ষ

করিতে এত অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছিলাম যে যখন বালিতে ও চাটার্জী মহাশয়ে ঝগড়া লাগিয়া গিয়াছিল, আমরা তখন প্রতিক্ষণে এই প্রত্যাশায় ছিলাম যে ব্যারিষ্টার মহাশয়ের উপর এবার দাঁড়াইবার শাস্তি প্রচারিত হইবে। বালি সাহেব কিন্তু উল্টা উপায় ধরিলেন, চীৎকার করিয়া "Sit down Mr. Chatterji" বলিয়া তাঁহার আলিপুর স্কুলের এই নবাগত দুরন্ত ছাত্রকে বসাইয়া দিলেন। যেমন এক একজন মাষ্টার, ছাত্র কোন প্রশ্ন করিলে বা পড়ার সময় অতিরিক্ত ব্যাখ্যা চাহিলে, বিরক্ত হইয়া তাহাকে শাসাইয়া দেন, বালিও আসামীর উকিল আপত্তি করিলে বিরক্ত হইয়া তাহাকে শাসাইতেন। কোন কোন সাক্ষী নর্টনকে ব্যতিব্যস্ত করিত। নর্টন বাহির করিতে চাহিতেন যে অমুক লেখা অমুক আসামীর হস্তাক্ষর, সাক্ষী যদি বলিতেন, না, এ ত ঠিক সেই লেখার মত লেখা নয়, তবে হইতে পারে, বলা যায় না,—অনেক সাক্ষী এইরূপ উত্তর দিতেন, নর্টন ইহাতে অধীর হইতেন। বকিয়া ঝকিয়া, চেঁচাইয়া শাসাইয়া কোন উপায়ে অভীপ্সিত উত্তর বাহির করিবার চেষ্টা করিতেন। তাঁহার শেষ প্রশ্ন এই হইত, "What is your belief?" তুমি কি মনে কর, হাঁ কি না। সাক্ষী হাঁ-ও বলিতে পারিতেন না, না-ও বলিতে পারিতেন না, বারবার ঘুরিয়া ফিরিয়া সেই উত্তরই করিতেন। নর্টনকে বুঝাইবার চেষ্টা করিতেন যে তাঁহার কোনও belief নাই, তিনি সন্দেহে দোলায়মান। কিন্তু নর্টন সেই উত্তর চাহিতেন না, বারবার মেঘ-গর্জ্জনের রবে সেই সাংঘাতিক প্রশ্নে সাক্ষীর মাথায় বজ্রাঘাত পড়িত, "Come, sir, what is your belief?" নর্টনের রাগে বালি রাগিয়া উপর হইতে গর্জ্জন করিতেন, "টোমার বিস্ওয়াস কি আছে?" বেচারা সাক্ষী মহা ফাঁপরে পড়িতেন। তাঁহার কোন বিস্ওয়াস নাই, অথচ একদিকে ম্যাজিষ্ট্রেট, অপর দিকে নর্টন ক্ষুধিত ব্যাঘ্রের ন্যায় তাঁহার নাড়ী ভুঁড়ি ছিঁড়িয়া সেই অমূল্য অপ্রাপ্য বিস্ওয়াস বাহির করিতে কৃতোদ্যম হইয়া দুইদিক হইতে ভীষণ গর্জ্জন করিতেছেন। প্রায়ই বিস্ওয়াস বাহির হইত না, সাক্ষী ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে ঘূর্ণ্যমান বুদ্ধিতে তাঁহার যন্ত্রণাস্থান হইতে প্রাণ লইয়া পলাইয়া যাইতেন। এক একজন বিস্ওয়াসের অপেক্ষা প্রাণই প্রিয় জিনিস বলিয়া কৃত্রিম বিস্ওয়াস নর্টন সাহেবের চরণকমলে উপহার দিয়া বাঁচিতেন, নর্টনও অতি সন্তুষ্ট হইয়া বাকী জেরা স্নেহের সহিত সম্পন্ন করিতেন। এইরূপ কৌন্সিলীর সঙ্গে এইরূপ ম্যাজিষ্ট্রেট জুটিয়াছিলেন বলিয়া মোকদ্দমা আরও নাটকের আকার ধারণ করিয়াছিল।

কয়েকজন সাক্ষী এইরূপ বিরুদ্ধাচরণ করিলেও অধিকাংশই নর্টন সাহেবের প্রশ্নের অনুকূল উত্তর দিতেন। ইহাদের মধ্যে চেনা মুখ অতি অল্পই ছিল। এক একজন কিন্তু পরিচিত ছিলেন। দেবদাস করণ মহাশয় আমাদের বিরক্তি দূর করিয়া খুব হাসাইয়াছিলেন, তাহার জন্য আমরা তাঁহার নিকট চিরকাল কৃতজ্ঞতার ঋণে আবদ্ধ। এই সত্যবাদী সাক্ষী সাক্ষ্য দিয়াছিলেন যে, যখন মেদিনীপুর সম্মিলনীর সময় সুরেন্দ্রবাবু তাঁহার ছাত্রের নিকটে গুরুভক্তি

প্রার্থনা করিয়াছিলেন, অরবিন্দবাবু তখন বলিয়া উঠিয়াছিলেন "দ্রোণ কি করিলেন?" ইহা শুনিয়া নর্টন সাহেবের আগ্রহ ও কৌতূহলের সীমা ছিল না, তিনি নিশ্চয় ভাবিয়াছিলেন দ্রোণ কোন বোমার ভক্ত বা রাজনৈতিক হত্যাকারী, অথবা মাণিকতলা বাগান বা ছাত্র ভাণ্ডারের সঙ্গে সংযুক্ত। নর্টন মনে করিয়াছিলেন এই বাক্যের অর্থ বোধ হয় যে অরবিন্দ ঘোষ সুরেন্দ্রবাবুকে গুরুভক্তির বদলে বোমারূপ পুরস্কার দিবার পরামর্শ দিয়াছিলেন, তাহা হইলে মোকদ্দমার অনেক সুবিধা হইতে পারে। অতএব তিনি আগ্রহে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "দ্রোণ কি করিলেন?" প্রথমতঃ সাক্ষী কিছুতেই প্রশ্নের উদ্দেশ্য বুঝিতে পারেন নাই। তাহা লইয়া পাঁচ মিনিট টানাটানি হয়, শেষে করণ মহাশয় দুই হাত আকাশে নিক্ষেপ করিয়া নর্টনকে জানাইলেন, "দ্রোণ অনেক অনেক আশ্চর্য্য কাণ্ড করিয়াছিলেন।" ইহাতে নর্টন সাহেব সন্তুষ্ট হইলেন না। দ্রোণের বোমার অনুসন্ধান না পাইলে সন্তুষ্ট হইবেন কেন? আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "অনেক কাণ্ড আবার কি? বিশেষ কি করিলেন বলুন?" সাক্ষী ইহার অনেক উত্তর করিলেন, কিন্তু একটিতেও দ্রোণাচার্য্যের জীবনময় এই গুপ্ত রহস্য ভেদ হয় নাই। নর্টন সাহেব চটিলেন, গর্জ্জন আরম্ভ করিলেন। সাক্ষীও চীৎকার আরম্ভ করিলেন। একজন উকিল হাসিয়া এই সন্দেহ প্রকাশ করিলেন যে, সাক্ষী বোধ হয় জানেন না, দ্রোণ কি করিলেন। করণ মহাশয় ইহাতে ক্রোধে অভিমানে আগুন হইলেন। চীৎকার করিয়া বলিলেন, "কি? আমি? আমি জানি না দ্রোণ কি করিলেন? বাঃ, আমি কি আদ্যোপান্ত মহাভারত বৃথা পড়িয়াছি?" আধঘন্টা দ্রোণাচার্য্যের মৃতদেহ লইয়া করণে নর্টনে মহাযুদ্ধ চলিল। প্রতি পাঁচ মিনিট অন্তর নর্টন আলিপুর বিচারালয় কম্পিত করিয়া তাঁহার প্রশ্ন ঘোষণা করিতে লাগিলেন, "Out with it, Mr. Editor! What did Dron do?" সম্পাদক মহাশয় উত্তরে এক লম্বা রামকাহিনী আরম্ভ করিলেন, তাহাতে দ্রোণ কি করিলেন, তাহার বিশ্বাসযোগ্য সংবাদ পাওয়া গেল না। সমস্ত আদালত হাসির মহা রোলে প্রতিধ্বনিত হইল। শেষে টিফিনের সময়ে করণ মহাশয় মাথা ঠাণ্ডা করিয়া একটু ভাবিয়া চিন্তিয়া ফিরিয়া আসিলেন এবং সমস্যার এই মীমাংসা জানাইলেন যে, বেচারা দ্রোণ কিছুই করেন নাই, বৃথাই আধ ঘন্টাকাল তাঁহার পরলোকগত আত্মা লইয়া টানাটানি হইয়াছে, অর্জ্জুনই গুরু দ্রোণকে বধ করিয়াছিলেন। অর্জ্জুনের এই মিথ্যা অপবাদে দ্রোণাচার্য্য অব্যাহতি পাইয়া কৈলাসে সদাশিবকে ধন্যবাদ দিয়াছিলেন যে, করণ মহাশয়ের সাক্ষ্যে আলিপুর বোমার মোকদ্দমায় তাঁহাকে কাঠগড়ায় দাঁড়াইতে হইল না। সম্পাদক মহাশয়ের এক কথায় সহজে অরবিন্দ ঘোষের সঙ্গে তাঁহার সম্বন্ধ সপ্রমাণ হইত। কিন্তু আশুতোষ সদাশিব তাঁহাকে রক্ষা করিলেন।

যাঁহারা সাক্ষ্য দিতে আসিয়াছিলেন, তাঁহারা তিন শ্রেণীতে বিভক্ত হইতে

পারেন। পুলিস ও গোয়েন্দা, পুলিসের প্রেমে আবদ্ধ নিম্নশ্রেণীর লোক ও ভদ্রলোক এবং স্বদোষে পুলিসের প্রেমে বঞ্চিত, অনিচ্ছায় আগত সাক্ষীচয়। প্রত্যেক শ্রেণীর সাক্ষ্য দিবার প্রথা স্বতন্ত্র ছিল। পুলিস মহোদয়গণ প্রফুল্লভাবে অম্লানবদনে তাঁহাদের পূর্ব্বজ্ঞাত বক্তব্য মনের মত বলিয়া যাইতেন, যাহাকে চিনিতে হয়, চিনিয়া লইতেন, কোনও সন্দেহ নাই, দ্বিধা নাই, ভুলচুক নাই। পুলিসের বন্ধুসকল অতিশয় আগ্রহের সহিত সাক্ষ্য দিতেন, যাহাকে চিনিতে হয়, তাহাকেও চিনিয়া লইতেন, যাহাকে চিনিতে হয় না, তাহাকেও অনেকবার অতিমাত্র আগ্রহের চোটে চিনিয়া লইতেন। অনিচ্ছায় আগত যাঁহারা, তাঁহারা যাহা জানিতেন, তাহা বলিতেন, কিন্তু তাহা অতি অল্প হইত; নর্টন সাহেব তাহাতে অসন্তুষ্ট হইয়া সাক্ষীর পেটে অশেষ মূল্যবান ও সন্দেহনাশক প্রমাণ আছে ভাবিয়া জেরার জোরে পেট চিরিয়া তাহা বাহির করিবার বিস্তর চেষ্টা করিতেন। ইহাতে সাক্ষীগণ মহা বিপদে পড়িতেন। এক দিকে নর্টন সাহেবের গর্জ্জন ও বার্লি সাহেবের আরক্ত চক্ষু, অপর দিকে মিথ্যা সাক্ষ্যে দেশবাসীকে দ্বীপান্তরে পাঠাইবার মহাপাপ। নর্টন ও বার্লিকে সন্তুষ্ট করিবেন, না ভগবানকে সন্তুষ্ট করিবেন, সাক্ষীর পক্ষে এই প্রশ্ন গুরুতর হইয়া উঠিত। এক দিকে মানুষের ক্রোধে ক্ষণস্থায়ী বিপদ, অপর দিকে পাপের শাস্তি নরক ও পরজন্মে দুঃখ। কিন্তু তিনি ভাবিতেন, নরক ও পরজন্ম এখনও দূরবর্ত্তী অথচ মনুষ্যকৃত বিপদ পরমুহূর্ত্তে গ্রাস করিতে পারে। কবে মিথ্যা সাক্ষ্য দিতে নারাজ হওয়ায় মিথ্যা সাক্ষ্য দিবার অপরাধে ধৃত হইবেন, সেই ভয় অনেকের মনে বিদ্যমান থাকিবার কথা, কারণ এইরূপ স্থলে পরিণামের দৃষ্টান্ত বিরল নহে। অতএব এই শ্রেণীর সাক্ষীর পক্ষে তাঁহারা যতক্ষণ সাক্ষীর কাঠগড়ায় অতিবাহিত করিতেন, ততক্ষণ বিলক্ষণ ভীতি ও যন্ত্রণার সময় হইত। জেরা শেষ হইলে অর্দ্ধনির্গত প্রাণ আবার ধড়ে ফিরিয়া আসিয়া তাঁহাদিগকে যন্ত্রণা - মুক্ত করিত। কয়েকজন সাহসের সহিত সাক্ষ্য দিয়া নর্টনের গর্জ্জনে ভ্রূক্ষেপও করেন নাই, ইংরাজ কৌন্সিলীও তাহা দেখিয়া জাতীয় প্রথা অনুসরণ পূর্ব্বক নরম হইয়া পড়িতেন। এইরূপ কত সাক্ষী আসিয়া কত প্রকার সাক্ষ্য দিয়া গেলেন, কিন্তু একজনও পুলিসের উল্লেখযোগ্য কোন সুবিধা করেন নাই। একজন স্পষ্ট বলিলেন, আমি কিছুই জানি না, কেন পুলিস আমাকে টানিয়া আনিয়াছেন, তাহা বুঝি না! এইরূপ মোকদ্দমা করিবার প্রথা বোধ হয়, ভারতেই হইতে পারে, অন্য দেশ হইলে জজ ইহাতে চটিয়া উঠিতেন ও পুলিসকে তীব্র গঞ্জনার সহিত শিক্ষা দিতেন। বিনা অনুসন্ধানে দোষী-নির্দ্দোষী নির্ব্বিচারে কাঠগড়ায় দাঁড় করাইয়া আন্দাজে শত শত সাক্ষী আনিয়া দেশের টাকা নষ্ট করা এবং নিরর্থক আসামীদিগকে কারাযন্ত্রণার মধ্যে দীর্ঘকাল রাখা, এই দেশেরই পুলিসের পক্ষে শোভা পায়। কিন্তু বেচারা পুলিস কি করিবে? তাঁহারা নামে গোয়েন্দা কিন্তু সেইরূপ ক্ষমতা যখন তাঁহাদের নাই, তখন এইরূপে সাক্ষীর জন্য বিশাল জাল ফেলিয়া উত্তম মধ্যম অধম সাক্ষী যোগাড়

করিয়া আন্দাজে কাঠগড়ায় উপস্থিত করাই একমাত্র উপায়। কে জানে, তাহারা কিছু জানিতেও পারে, কিছু প্রমাণ দিতেও পারে।

আসামী চিনিবার ব্যবস্থাও অতি রহস্যময় ছিল। প্রথমতঃ, সাক্ষীকে বলা হইত, তুমি কি ইহাদের মধ্যে কাহাকেও চিনিতে পারিবে? সাক্ষী যদি বলিতেন, হাঁ, চিনিতে পারি, তৎক্ষণাৎ নর্টন সাহেব হর্ষোৎফুল্ল হইয়া কাঠগড়ায় identification parade এর ব্যবস্থা করাইয়া তাঁহাকে সেইখানে তাঁহার স্মরণশক্তি চরিতার্থ করিবার আদেশ দিতেন। যদি তিনি বলিতেন, জানি না, হয়ত চিনিতেও পারি, তিনি একটু বিমর্ষ হইয়া বলিতেন, আচ্ছা যাও, চেষ্টা কর। যদি কেহ বলিতেন, না, পারিব না, তাহাদের দেখি নাই অথবা লক্ষ্য করি নাই; তথাপি নর্টন সাহেব তাঁহাকে ছাড়িতেন না। যদি এতগুলি মুখ দেখিয়া পূর্ব্বজন্মের কোনও স্মৃতি জাগ্রত হয়, সেই জন্য তাঁহাকে পরীক্ষা করিতে পাঠাইতেন। সাক্ষীর তেমন যোগশক্তি ছিল না। হয় ত পূর্ব্ব-জন্মবাদে আস্থাও নাই, তিনি আসামীদের দীর্ঘ দুই শ্রেণীর আদি হইতে অন্ত পর্য্যন্ত সার্জ্জেন্টের নেতৃত্বের অধীনে গম্ভীর ভাবে কুচ করিয়া আমাদের মুখের দিকে না চাহিয়াও মাথা নাড়িয়া বলিতেন, না, চিনি না। নর্টন নিরাশ হৃদয়ে এই মৎস্যশূন্য জীবন্ত জাল ফিরাইয়া লইতেন। এই মোকদ্দমায় মনুষ্যের স্মরণশক্তি কতদূর প্রখর ও অভ্রান্ত হইতে পারে, তাহার অপূর্ব্ব প্রমাণ পাওয়া গেল। ত্রিশ চল্লিশ জন দাঁড়াইয়া আছেন, তাঁহাদের নাম জানা নাই, তাঁহাদের সহিত কোন জন্মে একবারও আলাপ হয় নাই, অথচ দুইমাস পূর্ব্বে কাহাকে দেখিয়াছি, কাহাকে দেখি নাই, অমুককে অমুক তিন স্থানে দেখিয়াছি, অমুক দুইস্থানে দেখি নাই;--উহাকে দাঁত মাজিতে একবার দেখিয়াছি অতএব তাঁহার চেহারা আমার মনে জন্ম-জন্মান্তরের মত অঙ্কিত হইয়া রহিল। ইহাকে কবে দেখিলাম কি করিতেছিলেন, কে সঙ্গে ছিলেন, না একাকী ছিলেন, কিছুই মনে নাই, অথচ তাঁহারও চেহারা আমার মনে জন্ম-জন্মান্তরের জন্য অঙ্কিত হইয়া রহিল; হরিকে দশবার দেখিয়াছি সুতরাং তাঁহাকে ভুলিবার কোন সম্ভাবনা নাই, শ্যামকে একবার মোটে আধ মিনিটের জন্য দেখিলাম, কিন্তু তাহাকেও মরণের অন্তিম দিন পর্য্যন্ত ভুলিতে পারিব না, কোন ভুল হইবার সম্ভাবনা নাই,--এইরূপ স্মরণশক্তি এই অসম্পূর্ণ মানব প্রকৃতিতে, এই তমাভিভূত মর্ত্ত্যধামে সচরাচর দেখা যায় না। অথচ একজনের নহে, দুই জনের নহে, প্রত্যেক পুলিস পুঙ্গবের এইরূপ বিচিত্র নির্ভুল অভ্রান্ত স্মরণশক্তি দেখা গেল। এতদ্বারা সী, আই, ডী,-র উপর আমাদের ভক্তি শ্রদ্ধা দিন দিন প্রগাঢ় হইতে লাগিল। দুঃখের কথা, সেসন্স কোর্টে এই ভক্তি কমাইতে হইয়াছিল। ম্যাজিষ্ট্রেটের কোর্টে যে দুই একবার সন্দেহ হয় নাই তাহাও নয়। যখন লেখা সাক্ষ্যে দেখিলাম যে, শিশির ঘোষ এপ্রিল মাসে বোম্বাইতে ছিলেন অথচ কয়েক-জন পুলিস পুঙ্গব ঠিক সেই সময়ে তাঁহাকে স্কটস্ লেনে ও হ্যারিসন রোডে দেখিয়াছিলেন, তখন একটু সন্দেহ হইল বটে। যখন শ্রীহট্টবাসী বীরেন্দ্রচন্দ্র

সেন স্থূল শরীরে বানিয়াচঙ্গে পিতৃভবনে থাকিয়াও বাগানে ও স্কটস্ লেনে-- যে স্কটস্ লেনের ঠিকানা বীরেন্দ্র জানিতেন না, ইহার অকাট্য প্রমাণ লেখা সাক্ষ্যে পাওয়া গেল--তাঁহার সূক্ষ্ম শরীর সী. আই. ডী.র সূক্ষ্ম দৃষ্টিগোচর হইয়াছিল, তখন আরও সন্দেহ হইল। বিশেষতঃ যাঁহারা স্কটস্ লেনে কখনও পদার্পণ করেন নাই, তাঁহারা যখন শুনিলেন যে সেখানে পুলিস তাঁহাদিগকে অনেকবার দেখিয়াছেন, তখন একটু সন্দেহের উদ্রেক হওয়া নিতান্ত অস্বাভাবিক নহে। একজন মেদিনীপুরের সাক্ষী বলিলেন যে তিনি--মেদিনীপুরের আসামীরা বলিলেন যে তিনিই গোয়েন্দা--শ্রীহট্টের হেমচন্দ্র সেনকে তমলুকে বক্তৃতা করিতে দেখিয়াছিলেন। কিন্তু হেমচন্দ্র স্থূল চক্ষে কখন তমলুক দেখেন নাই, অথচ তাঁহার ছায়াময় শরীর দূর শ্রীহট্ট হইতে তমলুকে ছুটিয়া তেজস্বী ও রাজদ্রোহপূর্ণ স্বদেশী বক্তৃতা করিয়া গোয়েন্দা মহাশয়ের চক্ষুতৃপ্তি এবং কর্ণতৃপ্তি সম্পাদন করিয়াছিল। কিন্তু চন্দননগরের চারুচন্দ্র রায়ের ছায়াময় শরীর মাণিকতলায় উপস্থিত হইয়া আরও রহস্যময় কাণ্ড করিয়াছিল। দুই জন পুলিস কর্ম্মচারী শপথ করিয়া বলিলেন যে, তাঁহারা অমুক দিনে অমুক সময়ে চারুবাবুকে শ্যামবাজারে দেখিয়াছিলেন, তিনি শ্যামবাজার হইতে একজন মুখ্য ষড়যন্ত্রকারীর সহিত মাণিকতলার বাগানে হাঁটিয়া গিয়াছিলেন, তাঁহারাও সেই পর্য্যন্ত তাঁহার অনুসরণ করিয়াছিলেন, তাঁহারা অতি নিকট হইতে দেখিয়া লক্ষ্য করিয়াছিলেন; ভুল হইবার কথা নাই। উকিলের জেরায় সাক্ষীদ্বয় টলেন নাই। ব্যাসস্য বচনং সত্যং, পুলিসের সাক্ষ্যও অন্যরূপ হইতে পারে না। দিন ও সময় সম্বন্ধেও তাঁহাদের ভুল হইবার কথা নহে, কারণ ঠিক সেইদিনে সেই সময়ে চারুবাবু কলেজ হইতে ছুটি লইয়া কলিকাতায় উপস্থিত ছিলেন, চন্দননগরের ডুপ্লে কলেজের অধ্যক্ষের সাক্ষ্যে ইহা প্রমাণিত হইয়াছিল। কিন্তু আশ্চর্য্যের কথা, ঠিক সেই দিনে সেই সময়ে চারুবাবু হাওড়া ষ্টেশনের প্লাটফরমে চন্দননগরের মেয়র তাদিভাল, তাদিভালের স্ত্রী, চন্দননগরের গভর্ণর ও অন্যান্য সম্ভ্রান্ত য়ুরোপীয় ভদ্রলোকের সহিত কথা কহিতে কহিতে পায়চারি করিতেছিলেন। ইঁহারা সকলে সেই কথা স্মরণ করিয়া চারুবাবুর পক্ষে সাক্ষ্য দিতে সম্মত হইয়াছিলেন। ফ্রেঞ্চ গভর্ণমেন্টের চেষ্টায় পুলিস চারুবাবুকে মুক্তি দেওয়ায় বিচারালয়ে এই রহস্য উদ্‌ঘাটন হয় নাই। চারুবাবুকে এই পরামর্শ প্রদান করিতেছি যে তিনি এই প্রমাণ সকল Psychical Research Society র নিকট পাঠাইয়া মনুষ্যজাতির জ্ঞান-সঞ্চয়ের সাহায্য করুন। পুলিসের সাক্ষ্য মিথ্যা হইতে পারে না,-- বিশেষতঃ সী, আই, ডী,র --অতএব থিয়সফীর আশ্রয় ভিন্ন আমাদের আর উপায় নাই। মোটের উপর বৃটিশ আইন প্রণালীতে কত সহজে নির্দ্দোষীর কারাদণ্ড, কালা-পানি ও ফাঁসি পর্য্যন্ত হইতে পারে, তাহার দৃষ্টান্ত এই মোকদ্দমায় পদে পদে পাইলাম। নিজে কাঠগড়ায় না দাঁড়াইলে পাশ্চাত্য বিচারপ্রণালীর মায়াবী অসত্যতা হৃদয়ঙ্গম করা যায় না। য়ুরোপের এই প্রণালী জুয়াখেলা বিশেষ;

ইহা মানুষের স্বাধীনতা, মানুষের সুখ-দুঃখ, তাঁহার ও তাঁহার পরিবার ও আত্মীয়-বন্ধুর জীবনব্যাপী যন্ত্রণা, অপমান, জীবন মৃত্যু লইয়া জুয়াখেলা। ইহাতে কত দোষী বাঁচে, কত নির্দ্দোষী মরে, তাহার ইয়ত্তা নাই। য়ুরোপে কেন Socialism ও Anarchism-এর এত প্রচার ও প্রভাব হইয়াছে, এই জুয়া-খেলার মধ্যে একবার আসিলে, এই নিষ্ঠুর নিৰ্ব্বিচার সমাজরক্ষক পেষণযন্ত্রের মধ্যে একবার পড়িলে তাহা প্রথম বোধগম্য হয়। এমত অবস্থায় ইহা আশ্চর্য্যের কথা নহে, যে অনেক উদারচেতা দয়ালু লোক বলিতে আরম্ভ করিয়াছেন, এই সমাজ ভাঙ্গিয়া দাও, চুরমার কর; এত পাপ, এত দুঃখ, এত নির্দ্দোষীর তপ্ত নিঃশ্বাসে ও হৃদয়ের শোণিতে যদি সমাজ রক্ষা করিতে হয়, তাহা হইলে তাহা রক্ষা করা নিষ্প্রয়োজন।

ম্যাজিষ্ট্রেটের কোর্টে একমাত্র বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা নরেন্দ্রনাথ গোস্বামীর সাক্ষ্য। সেই ঘটনা বর্ণনা করিবার পূর্ব্বে আমার বিপদের সঙ্গী বালক আসামীদের কথা বলি। কোর্টে ইহাদের আচরণ দেখিয়া বেশ বুঝিতে পারিয়াছিলাম যে, বঙ্গে নূতন যুগ আসিয়াছে, নূতন সন্ততি মায়ের কোলে বাস করিতে আরম্ভ করিয়াছে। সেকালের বাঙ্গালীর ছেলে দুই প্রকার ছিল, হয় শান্ত, শিষ্ট, নিরীহ, সচ্চরিত্র, ভীরু, আত্মসম্মান ও উচ্চাকাঙ্ক্ষা শূন্য; নয়ত দুশ্চরিত্র, দুর্দ্দান্ত, অস্থির, ঠগ, সংযম ও সততাশূন্য! এই দুই চরমাবস্থার মধ্যস্থলে নানারূপ জীব বঙ্গজননীর ক্রোড়ে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, কিন্তু আট দশজন অসাধারণ প্রতিভাবান শক্তিমান ভবিষ্যৎকালের পথপ্রদর্শক ভিন্ন এই দুই শ্রেণীর অতীত তেজস্বী আর্য্যসন্তান প্রায়ই দেখা যাইত না। বাঙ্গালীর বুদ্ধি ছিল, মেধাশক্তি ছিল, কিন্তু শক্তি ও মনুষ্যত্ব ছিল না। কিন্তু এই বালকগণকে দেখিয়াই বোধ হইত যেন অন্য কালের অন্য শিক্ষাপ্রাপ্ত উদারচেতা দুর্দ্দান্ত তেজস্বী পুরুষ সকল আবার ভারতবর্ষে ফিরিয়া আসিয়াছেন। সেই নির্ভীক সরল চাহনি, সেই তেজপূর্ণ কথা, সেই ভাবনাশূন্য আনন্দময় হাস্য, এই ঘোর বিপদের সময়ে সেই অক্ষুণ্ণ তেজস্বিতা, মনের প্রসন্নতা, বিমর্ষতা ভাবনা বা সন্তাপের অভাব, সেকালের তমঃক্লিষ্ট ভারতবাসীর নহে, নূতন যুগের নূতন জাতির, নূতন কর্ম্মস্রোতের লক্ষণ। ইহারা যদি হত্যাকারী হন, তবে বলিতে হয় যে, হত্যার রক্তময় ছায়া তাঁহাদের স্বভাবে পড়ে নাই, ক্রূরতা, উন্মত্ততা, পাশবিক ভাব তাঁহাদের মধ্যে আদবে ছিল না। তাঁহারা ভবিষ্যতের জন্য বা মোকদ্দমার ফলের জন্য লেশমাত্র চিন্তা না করিয়া কারাবাসের দিন বালকের আমোদে, হাস্যে, ক্রীড়ায়, পড়া-শুনায়, সমালোচনায় কাটাইয়াছিলেন। তাঁহারা অতি শীঘ্র জেলের কর্ম্মচারী, সিপাহী, কয়েদী, য়ুরোপীয় সার্জ্জেন্ট, ডিটেকটিভ, কোর্টের কর্ম্মচারী, সকলের সঙ্গে ভাব করিয়া লইয়াছিলেন এবং শত্রু মিত্র বড় ছোট বিচার না করিয়া সকলের সঙ্গে আমোদ গল্প ও উপহাস আরম্ভ

করিয়াছিলেন। কোর্টের সময় তাঁহাদের পক্ষে অতি বিরক্তিকর ছিল, কারণ মোকদ্দমা প্রহসনে রস অতি অল্প ছিল। এই সময় কাটাইবার জন্য তাঁহাদের পড়িবার বই ছিল না, কথা কহিবার অনুমতিও ছিল না। যাঁহারা যোগ আরম্ভ করিয়াছিলেন, তাঁহারা তখনও গণ্ডগোলের মধ্যে ধ্যান করিতে শেখেন নাই, তাঁহাদের পক্ষে সময় কাটান বড় কঠিন হইয়া উঠিত। প্রথমতঃ দুই চারিজন পড়িবার বই ভিতরে আনিতে লাগিলেন, তাঁহাদের দেখাদেখি আর সকলে সেই উপায় অবলম্বন করিলেন। তাহার পরে এই অদ্ভুত দৃশ্য দেখা যাইত যে, মোকদ্দমা চলিতেছে, ত্রিশ চল্লিশ জন আসামীর সমস্ত ভবিষ্যৎ লইয়া টানাটানি হইতেছে, তাহার ফল ফাঁসিকাষ্ঠে মৃত্যু বা যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর হইতে পারে, অথচ সেই আসামীগণ সেই দিকে দৃকপাত না করিয়া কেহ বঙ্কিমের উপন্যাস, কেহ বিবেকানন্দের রাজযোগ বা Science of Religions, কেহ গীতা, কেহ পুরাণ, কেহ য়ুরোপীয় দর্শন একাগ্রমনে পড়িতেছেন। ইংরাজ সার্জ্জেন্ট বা দেশী সিপাহী কেহই তাঁহাদের এই আচরণে বাধা দিত না। তাঁহারা ভাবিয়াছিলেন, ইহাতেই যদি এতগুলি পিঞ্জরাবদ্ধ ব্যাঘ্র শান্ত হইয়া থাকে, তাহা হইলে আমাদেরও কার্য্য লঘু হয়; অধিকন্তু ইহাতে কাহারও ক্ষতি নাই। কিন্তু একদিন বালি সাহেবের দৃষ্টি এই দৃশ্যের প্রতি আকৃষ্ট হইল, এই আচরণ ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের অসহ্য হইয়া উঠিল। দুই দিন তিনি কিছু বলেন নাই, পরে আর থাকিতে পারিলেন না, বইয়ের আমদানি বন্ধ করিবার হুকুম দিলেন। বাস্তবিক বালি এমন সুন্দর বিচার করিতেছেন, তাহা শ্রবণ করিয়া কোথায় সকলে আনন্দ লাভ করিবেন, না সকলে বই পড়িতেন। ইহাতে বালির গৌরব ও বৃটিশ জষ্টিসের মহিমার প্রতি ঘোর অসম্মান প্রদর্শন করা হইত সন্দেহ নাই।

আমরা যতদিন স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ঘরে আবদ্ধ ছিলাম, ততদিন কেবল গাড়ীতে, ম্যাজিস্ট্রেট আসিবার পূর্ব্বের একঘন্টা বা আধঘন্টাকাল এবং টিফিনের সময়ে কতকটা আলাপ করিবার অবসর পাইতাম। যাঁহাদের পরস্পরের সহিত পরিচয় বা আলাপ ছিল, তাঁহারা এই সময়ে cell-এর নীরবতা ও নির্জ্জনতার শোধ লইতেন, হাসি, আমোদ ও নানা বিষয়ের আলোচনায় সময় কাটাইতেন। কিন্তু এইরূপ অবসরে অপরিচিত লোকের সঙ্গে আলাপের সুবিধা হয় না, সেইজন্য আমার ভাই বারীন্দ্র ও অবিনাশ ভিন্ন আমি আর কাহারও সহিত অধিক আলাপ করিতাম না, তাঁহাদের হাসি ও গল্প শুনিতাম, স্বয়ং তাহাতে যোগ দিতাম না। কিন্তু একজন আমার কাছে মাঝে মাঝে ঘেঁসিয়া আসিতেন, তিনি ভাবী approver নরেন্দ্রনাথ গোস্বামী। অন্য বালকদের ন্যায় তাঁহার শান্ত ও শিষ্ট স্বভাব ছিল না, তিনি সাহসী, লঘুচেতা এবং চরিত্রে, কথায়, কর্ম্মে অসংযত ছিলেন। ধৃত হইবার কালে নরেন গোঁসাই তাঁহার স্বাভাবিক সাহস ও প্রগল্‌ভতা দেখাইয়াছিলেন, কিন্তু লঘুচেতা বলিয়া কারাবাসের যৎকিঞ্চিৎ দুঃখ অসুবিধা সহ্য করা তাঁহার পক্ষে অসাধ্য হইয়াছিল। তিনি

জমিদারের ছেলে সুতরাং সুখে, বিলাসে, দুর্নীতিতে লালিত হইয়া কারাগৃহের কঠোর সংযম ও তপস্যায় অত্যন্ত কাতর হইয়াছিলেন, আর সেই ভাব সকলের নিকট প্রকাশ করিতেও কুণ্ঠিত হন নাই। যে কোন উপায়ে এই যন্ত্রণা হইতে মুক্ত হইবার উৎকট বাসনা তাঁহার মনে দিন দিন বাড়িতে লাগিল। প্রথম তাঁহার এই আশা ছিল যে নিজের স্বীকারোক্তি প্রত্যাহার করিয়া প্রমাণ করিতে পারিবেন যে পুলিস তাঁহাকে শারীরিক যন্ত্রণা দিয়া দোষ স্বীকার করাইয়াছিলেন। তিনি আমাদের নিকট জানাইলেন যে, তাঁহার পিতা সেইরূপ মিথ্যা সাক্ষী যোগাড় করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিলেন। কিন্তু অল্প দিনেই আর এক ভাব প্রকাশ পাইতে লাগিল। তাঁহার পিতা ও একজন মোক্তার তাঁহার নিকট জেলে ঘন ঘন যাতায়াত আরম্ভ করিলেন, শেষে ডিটেকটিভ শামসুল আলমও তাঁহার নিকট আসিয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া গোপনে কথাবার্ত্তা কহিতে লাগিলেন। এই সময়ে হঠাৎ গোঁসাইয়ের কৌতূহল ও প্রশ্ন করিবার প্রবৃত্তি হইয়াছিল বলিয়া অনেকের সন্দেহের উদ্রেক হয়। ভারতবর্ষের বড় বড় লোকের সহিত তাঁহাদের আলাপ বা ঘনিষ্ঠতা ছিল কি না, গুপ্ত সমিতিকে কে কে আর্থিক সাহায্য দিয়া তাহা পোষণ করিয়াছিলেন, সমিতির লোক বাহিরে বা ভারতের অন্যান্য প্রদেশে কে কে ছিল, কাহারা এখন সমিতির কার্য্য চালাইবেন, কোথায় শাখা সমিতি রহিয়াছে ইত্যাদি অনেক ছোট বড় প্রশ্ন বারীন্দ্র ও উপেন্দ্রকে করিতেন। গোঁসাইয়ের এই জ্ঞানতৃষ্ণার কথা অচিরাৎ সকলের কর্ণগোচর হইল এবং শামসুল আলমের সঙ্গে তাঁহার ঘনিষ্ঠতার কথাও আর গোপনীয় প্রেমালাপ না হইয়া open secret হইয়া উঠিল। ইহা লইয়া অনেক আলোচনা হয় এবং কেহ কেহ ইহাও লক্ষ্য করে যে এইরূপ পুলিস দর্শনের পরই সর্ব্বদা নব নব প্রশ্ন গোঁসাইয়ের মনে জুটিত। বলা বাহুল্য তিনি এই সকল প্রশ্নের সন্তোষজনক উত্তর পান নাই। যখন প্রথম এই কথা আসামীদের মধ্যে রাষ্ট্র হইতে লাগিল, তখন গোঁসাই স্বয়ং স্বীকার করিয়াছিলেন যে পুলিস তাঁহার নিকট আসিয়া "রাজার সাক্ষী" হইবার জন্য তাঁহাকে নানা উপায়ে বুঝাইবার চেষ্টা করিতেছেন। তিনি আমাকে কোর্টে একবার এই কথা বলিয়াছিলেন। আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, "আপনি কি উত্তর দিয়াছেন?" তিনি বলিলেন, "আমি কি শুনিব! আর শুনিলেও আমি কি জানি যে তাঁহাদের মনের মত সাক্ষ্য দিব?" তাহার কিয়ৎদিন পরে আবার যখন এই কথা উল্লেখ করিলেন, তখন দেখিলাম, ব্যাপারটা অনেক দূরে গড়াইয়াছে। জেলে Identification Parade - এর সময় আমার পার্শ্বে গোঁসাই দাঁড়াইয়াছিলেন, তখন তিনি আমাকে বলেন, "পুলিস কেবলই আমার নিকট আসেন।" আমি উপহাস করিয়া বলিলাম, "আপনি এই কথা বলুন না কেন যে সার আন্দ্রু ফ্রেজার গুপ্ত সমিতির প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন, তাহা হইলে তাঁহাদের পরিশ্রম সার্থক হইবে।" গোঁসাই বলিলেন, "সেই ধরণের কথা বলিয়াছি বটে। আমি তাঁহাকে বলিয়াছি যে সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জ্জি আমাদের head এবং তাঁহাকে

একবার বোমা দেখাইয়াছি।" আমি স্তম্ভিত হইয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "এই কথা বলিবার প্রয়োজন কি ছিল?" গোঁসাই বলিলেন, "আমি –দের শ্রাদ্ধ করিয়া ছাড়িব। সেই ধরণের আরও অনেক খবর দিয়াছি। বেটারা corroboration খুঁজিয়া খুঁজিয়া মরুক। কে জানে, এই উপায়ে মোকদ্দমা ফাঁসিয়া যাইতেও পারে।" ইহার উত্তরে আমি কেবল বলিয়াছিলাম, "এই নষ্টামি ছাড়িয়া দিন। উহাদের সঙ্গে চালাকী করিতে গেলে নিজে ঠকিবেন।" জানি না, গোঁসাইয়ের এই কথা কতদূর সত্য ছিল। আর সকল আসামীদের এই মত ছিল যে আমাদের চক্ষে ধূলা দিবার জন্য তিনি এই কথা বলিয়াছিলেন, আমার বোধ হয় যে তখনও গোঁসাই approver হইতে সম্পূর্ণ কৃতনিশ্চয় হন নাই, তাঁহার মন সেই দিকে অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছিল সত্য, কিন্তু পুলিসকে ঠকাইয়া তাঁহাদের কেস মাটি করিবার আশাও তাঁহার ছিল। চালাকী ও অসদুপায়ে কার্য্যসিদ্ধি দুষ্প্রবৃত্তির স্বাভাবিক প্রেরণা। তখন হইতে বুঝিতে পারিলাম যে, গোঁসাই পুলিসের বশ হইয়া সত্য মিথ্যা তাহাদের যাহা প্রয়োজন, তাহা বলিয়া নিজে রক্ষা পাইবার চেষ্টা করিবেন। একটী নীচ স্বভাবের আরও নিম্নতর দুষ্কর্ম্মের দিকে অধঃপতন আমাদের চক্ষের সম্মুখে নাটকের মত অভিনীত হইতে লাগিল। আমি দিন দিন দেখিলাম, গোঁসাইয়ের মন কিরূপে বদলাইয়া যাইতেছে, তাহার মুখ, ভাবভঙ্গী, কথাবার্ত্তারও পরিবর্ত্তন হইতেছে। তিনি যে বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া তাঁহার সঙ্গীদের সর্ব্বনাশ করিবার যোগাড় করিতেছিলেন, তাহার সমর্থন জন্য ক্রমে ক্রমে নানা অর্থনৈতিক ও রাজনীতিক যুক্তি বাহির করিতে লাগিলেন। এমন interesting psychological study প্রায়ই হাতের নিকট পাওয়া যায় না।

প্রথম কেহই গোঁসাইকে জানিতে দিলেন না যে সকলে তাঁহার অভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়াছেন। তিনিও এমন নির্ব্বোধ যে অনেক দিন ইহার কিছু বুঝিতে পারেন নাই, তিনি ভাবিয়াছিলেন, আমি খুব গোপনে পুলিসের সাহায্য করিতেছি। কিন্তু কয়েক দিন পরে যখন হুকুম হইল যে, আর আমাদের নির্জ্জন কারাবাসে না রাখিয়া একসঙ্গে রাখা হইবে, তখন সেই নূতন ব্যবস্থায় পরস্পরের সহিত রাত-দিন দেখা ও কথাবার্ত্তা হওয়ায় আর বেশী দিন কিছুই লুকাইয়া রাখিবার সম্ভাবনা ছিল না। এই সময়ে দুই একজন বালকের সঙ্গে গোঁসাইয়ের ঝগড়া হয়, তাহাদের কথায় ও সকলের অপ্রীতিকর ব্যবহারে গোঁসাই বুঝিতে পারিলেন যে, তাঁহার অভিসন্ধি কাহারও অজ্ঞাত নহে। যখন গোঁসাই সাক্ষ্য দেন, তখন কয়েকটি ইংরাজী কাগজে এই খবর বাহির হয় যে, আসামীগণ এই অপ্রত্যাশিত ঘটনায় চমৎকৃত ও উত্তেজিত হইলেন। বলা বাহুল্য ইহা নিতান্ত রিপোর্টাদেরই কল্পনা। অনেক দিন আগেই সকলে বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, এই প্রকার সাক্ষ্য দেওয়া হইবে। এমন কি, যে দিনে যে

সাক্ষ্য দেওয়া হইবে, তাহাও জানিতে পারা গিয়াছিল। এই সময়ে একজন আসামী গোঁসাইয়ের নিকট গিয়া বলিলেন--দেখ ভাই, আর সহ্য হয় না; আমিও approver হইব, তুমি শামসুল আলমকে বল আমারও যেন খালাস পাইবার ব্যবস্থা করেন। গোঁসাই সম্মত হইলেন, কয়েক দিন পরে তাঁহাকে বলিলেন যে, এই অর্থে গবর্ণমেন্ট হইতে চিঠি আসিয়াছে যে, সেই আসামীর নিবেদনের অনুকূল নির্ণয় (favourable consideration) হইবার সম্ভাবনা আছে। এই বলিয়া গোঁসাই তাহাকে উপেন প্রভৃতির নিকট হইতে এইরূপ কয়েকটি আবশ্যকীয় কথা বাহির করিতে বলিলেন, যেমন--কোথায় গুপ্ত সমিতির শাখা সমিতি ছিল, কাহারা তাহার নেতা, ইত্যাদি। নকল approver আমোদ-প্রিয় ও রসিক লোক ছিলেন, তিনি উপেন্দ্রনাথের সহিত পরামর্শ করিয়া গোঁসাইকে কয়েকটি কল্পিত নাম জানাইয়া বলিলেন যে, মান্দ্রাজে বিশ্বম্ভর পিলে, সাতারায় পুরুষোত্তম নাটেকর, বোম্বাইতে প্রোফেসার ভট্ট এবং বরোদায় কৃষ্ণাজীরাও ভাও এই গুপ্ত সমিতির শাখার নেতা ছিলেন। গোঁসাই আনন্দিত হইয়া এই বিশ্বাসযোগ্য সংবাদ পুলিসকে জানাইলেন। পুলিসও মাদ্রাজ তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিলেন, অনেক ছোট বড় পিলেকে পাইলেন, কিন্তু একটীও পিলে বিশ্বম্ভর বা অৰ্দ্ধ বিশ্বম্ভরও পাইলেন না, সাতারার পুরুষোত্তম নাটেকরও তাঁহার অস্তিত্ব ঘন অন্ধকারে গুপ্ত রাখিয়া রহিলেন, বোম্বাইয়ে একজন প্রোফেসার ভট্ট পাওয়া গেলেন, কিন্তু তিনি নিরীহ রাজভক্ত ভদ্রলোক, তাঁহার পিছনে কোন গুপ্ত সমিতি থাকিবার সম্ভাবনা ছিল না। অথচ সাক্ষ্য দিবার সময় গোঁসাই পূর্ব্বকালে উপেনের নিকট শোনা কথা বলিয়া কল্পনা-রাজ্য নিবাসী বিশ্বম্ভর পিলে ইত্যাদি ষড়যন্ত্রের মহারথীগণকে নর্টনের শ্রীচরণে বলি দিয়া তাঁহার অদ্ভুত prosecution theory পুষ্ট করিলেন। বীর কৃষ্ণাজীরাও ভাও লইয়া পুলিস আর একটি রহস্য করিলেন। তাঁহারা বাগান হইতে বরোদার কৃষ্ণাজীরাও দেশপাণ্ডের নামে কোনও "ঘোষ" দ্বারা প্রেরিত টেলিগ্রামের নকল বাহির করিলেন। সেইরূপ নামের কোন লোক ছিল কি না, বরোদাবাসী তাহার কোন সন্ধান পান নাই, কিন্তু যখন সত্যবাদী গোঁসাই বরোদাবাসী কৃষ্ণাজীরাও ভাওয়ের কথা বলিয়াছেন, তখন নিশ্চয় কৃষ্ণাজীরাও ভাও ও কৃষ্ণাজীরাও দেশপাণ্ডে একই। আর কৃষ্ণাজীরাও দেশপাণ্ডে থাকুন বা না থাকুন, আমাদের শ্রদ্ধেয় বন্ধু কেশবরাও দেশপাণ্ডের নাম চিঠিপত্রে পাওয়া গিয়াছিল। অতএব নিশ্চয় কৃষ্ণাজীরাও ভাও, কৃষ্ণাজীরাও দেশপাণ্ডে এবং কেশবরাও দেশপাণ্ডে একই লোক। ইহাতে প্রমাণিত হইল যে, কেশবরাও দেশ-পাণ্ডে গুপ্ত ষড়যন্ত্রের একজন প্রধান পাণ্ডা। এইরূপ অসাধারণ অনুমান সকলের উপর নর্টন সাহেবের সেই বিখ্যাত theory প্রতিষ্ঠিত ছিল।

গোঁসাইয়ের কথা বিশ্বাস করিলে ইহাই বিশ্বাস করিতে হয় যে, তাঁহারই কথায় আমাদের নির্জ্জন কারাবাস ঘুচিয়া যায় এবং আমাদের একত্র বাসের হুকুম হয়। তিনি বলিয়াছিলেন যে, পুলিস তাঁহাকে সকলের মধ্যে রাখিয়া

ষড়যন্ত্রের গুপ্ত কথা বাহির করিবার উদ্দেশ্যে এই ব্যবস্থা করেন। গোঁসাই জানিতেন না যে সকলে পূর্ব্বেই তাঁহার নূতন ব্যবসার কথা জানিতে পারিয়াছেন, সেইজন্য কাহারা ষড়যন্ত্রে লিপ্ত, কোথায় শাখা সমিতি, কে টাকা দিতেন বা সাহায্য করিতেন, কে এখন গুপ্ত সমিতির কার্য্য চালাইবেন, এইরূপ অনেক প্রশ্ন করিতে লাগিলেন। এই সকল প্রশ্নের কিরূপ উত্তর লাভ করিয়াছিলেন তাহার দৃষ্টান্ত উপরে দিয়াছি। কিন্তু গোঁসাইয়ের অধিকাংশ কথাই মিথ্যা। ডাক্তার ডেলি আমাদিগকে বলিয়াছেন যে, তিনিই এমারসন সাহেবকে বলিয়া কহিয়া এই পরিবর্ত্তন করাইয়াছিলেন। সম্ভবতঃ ডেলির কথাই সত্য; তাহার পরে হয়ত পুলিস নূতন ব্যবস্থার কথা অবগত হইয়া তাহা হইতে এইরূপ লাভের কল্পনা করিয়াছিলেন। যাহাই হউক, এই পরিবর্ত্তনে আমি ভিন্ন সকলের পরম আনন্দ হইল, আমি তখন লোকের সঙ্গে মিশিতে অনিচ্ছুক ছিলাম, সেই সময়ে আমার সাধনা খুব জোরে চলিতেছিল। সমতা, নিষ্কামতা ও শান্তির কতক কতক আস্বাদ পাইয়াছিলাম, কিন্তু তখনও সেই ভাব দৃঢ় হয় নাই। লোকের সঙ্গে মিশিলে, পরের চিন্তাস্রোতের আঘাত আমার অপক্ নবীন চিন্তার উপর পড়িলেই এই নব ভাব হ্রাস পাইতে পারে, ভাসিয়া যাইতেও পারে। বাস্তবিক তাহাই হইল। তখন বুঝিতাম না যে আমার সাধনের পূর্ণতার জন্য বিপরীত ভাবের উদ্রেক আবশ্যক ছিল, সেইজন্য অন্তর্য্যামী আমাকে হঠাৎ আমার প্রিয় নির্জ্জনতা হইতে বঞ্চিত করিয়া উদ্দাম রজোগুণের স্রোতে ভাসাইয়া দিলেন। আর সকলেই আনন্দে অধীর হইলেন। সেই রাত্রিতে যে ঘরে হেমচন্দ্র দাস, শচীন্দ্র সেন ইত্যাদি গায়ক ছিলেন সেই ঘর সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ ছিল, অধিকাংশ আসামী সেইখানে একত্র হইয়াছিলেন, এবং দুটা তিনটা রাত্রি পর্য্যন্ত কেহ ঘুমাইতে পারেন নাই। সারা রাত হাসির রোল, গানের অবিরাম স্রোত, এতদিনের রুদ্ধ গল্প বর্ষাকালের বন্যার মত বহিতে থাকায় নীরব কারাগার কোলাহলে ধ্বনিত হইল। আমরা ঘুমাইয়া পড়িলাম কিন্তু যতবার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল ততবারই শুনিলাম সেই হাসি, সেই গান, সেই গল্প সমান বেগে চলিতেছে। শেষ রাত্রে এই স্রোত ক্ষীণ হইয়া গেল, গায়কেরাও ঘুমাইয়া পড়িলেন, আমাদের ওয়ার্ড নীরব হইল।

কারাগৃহ ও স্বাধীনতা

মনুষ্যমাত্রেই প্রায় বাহ্য অবস্থার দাস, স্থূলজগতের অনুভূতির মধ্যেই আবদ্ধ। মানসিক ক্রিয়াসকল সেই বাহ্যিক অনুভূতিকেই আশ্রয় করে, বুদ্ধিও স্থূলের সঙ্কীর্ণ সীমা লঙ্ঘন করিতে অক্ষম; প্রাণের সুখদুঃখ বাহ্য ঘটনার প্রতিধ্বনি মাত্র। এই দাসত্ব শরীরের আধিপত্যজনিত। উপনিষদে বলা হইয়াছে, "জগৎস্রষ্টা স্বয়ম্ভূ শরীরের দ্বার সকল বহির্ম্মুখীন করিয়া গড়িয়াছেন বলিয়া সকলের দৃষ্টি বহির্জগতে আবদ্ধ, অন্তরাত্মাকে কেহও দেখে না। সেই ধীরপ্রকৃতি মহাত্মা বিরল যিনি অমৃতের বাসনায় ভিতরে চক্ষু ফিরাইয়া আত্মাকে প্রত্যক্ষ দর্শন করিয়াছেন।" আমরা সাধারণতঃ যে বহির্ম্মুখীন স্থূলদৃষ্টিতে মনুষ্যজাতির জীবন দেখি, সেই দৃষ্টিতে শরীরই আমাদের মুখ্য সম্বল। য়ুরোপকে যতই না জড়বাদী বলি, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে মনুষ্যমাত্রই জড়বাদী। শরীর ধর্ম্মসাধনের উপায়, আমাদের বহু-অশ্বযুক্ত রথ, যে দেহ-রথে আরোহণ করিয়া আমরা সংসার পথে ধাবিত হই। আমরা কিন্তু দেহের অযথার্থ প্রাধান্য স্বীকার করিয়া দেহাত্মক বুদ্ধিকে এমন প্রশ্রয় দিই যে বাহ্যিক কর্ম্ম ও বাহ্যিক শুভাশুভ দ্বারা সম্পূর্ণরূপে আবদ্ধ হইয়া থাকি। এই অজ্ঞানের ফল জীবন-ব্যাপী দাসত্ব ও পরাধীনতা। সুখদুঃখ শুভাশুভ সম্পদ-বিপদ আমাদের মানসিক অবস্থাকে নিজের অনুযায়ী করিতে সচেষ্ট ত হয়ই, আমরাও কামনার ধ্যানে সেই স্রোতে ভাসিয়া যাই। সুখলালসায় দুঃখভয়ে পরের আশ্রিত হই, পরের দত্ত সুখ, পরের দত্ত দুঃখ গ্রহণ করিয়া অশেষ কষ্ট ও লাঞ্ছনা ভোগ করি। কেন না, প্রকৃতি হৌক বা মনুষ্য হৌক, যে আমাদের শরীরের উপর কিঞ্চিন্মাত্র আধিপত্য করিতে পারে কিংবা নিজশক্তির অধিকারক্ষেত্রে আনিতে পারে, তাহারই প্রভাবের অধীন হইতে হয়। ইহার চরম দৃষ্টান্ত শত্রুগ্রস্ত বা কারাবদ্ধের অবস্থা। কিন্তু যিনি বন্ধুবান্ধববেষ্টিত হইয়া স্বাধীনভাবে মুক্ত আকাশে বিচরণ করেন, কারাবদ্ধের ন্যায় তাঁহারও এই দুর্দ্দশা। শরীরই কারাগৃহ, দেহাত্মকবুদ্ধিরূপ অজ্ঞানতা কারারূপ শত্রু।

এই কারাবাস মনুষ্যজাতির চিরন্তন অবস্থা। অপরপক্ষে সাহিত্য ও ইতিহাসের প্রত্যেক পৃষ্ঠায় মনুষ্যজাতির স্বাধীনতা লাভার্থ অদমনীয় উচ্ছ্বাস ও প্রয়াস দেখিতে পাই। যেমন রাজনীতিক বা সামাজিক ক্ষেত্রে, তেমনি ব্যক্তিগত জীবনে যুগে যুগে এই চেষ্টা। আত্মসংযম, আত্মনিগ্রহ, সুখ-দুঃখ বর্জ্জন, Stoicism, Epicureanism, asceticism, বেদান্ত, বৌদ্ধধর্ম্ম, অদ্বৈতবাদ, মায়াবাদ, রাজযোগ, হঠযোগ, গীতা, জ্ঞানমার্গ, ভক্তিমার্গ, কর্ম্ম-

মার্গ,—নানা পন্থা একই গম্যস্থান। উদ্দেশ্য—শরীর জয়, স্থূলের আধিপত্য বর্জ্জন, আন্তরিক জীবনের স্বাধীনতা। পাশ্চাত্য বিজ্ঞানবিদ্‌গণ এই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে স্থূলজগৎ ভিন্ন অন্য জগৎ নাই, স্থূলের উপর সূক্ষ্ম প্রতিষ্ঠিত, সূক্ষ্ম অনুভব স্থূল অনুভবের প্রতিকৃতি মাত্র, মনুষ্যের স্বাধীনতাপ্রয়াস ব্যর্থ; ধর্ম্মদর্শন বেদান্ত অলীক কল্পনা, সম্পূর্ণ ভূতপ্রকৃতি-আবদ্ধ আমাদের সেই বন্ধনমোচনে বা ভূতপ্রকৃতির সীমা উল্লঙ্ঘনে মিথ্যা চেষ্টা। কিন্তু মানব-হৃদয়ের এমন গূঢ়তর স্তরে এই আকাঙ্ক্ষা নিহিত যে সহস্র যুক্তিও তাহা উন্মূলন করিতে অসমর্থ। মনুষ্য বিজ্ঞানের সিদ্ধান্তে কখনও সন্তুষ্ট থাকিতে পারে না। চিরকাল মনুষ্য অস্পষ্টরূপে অনুভব করিয়া আসিতেছেন যে স্থূলজয়ে সমর্থ সূক্ষ্ম বস্তু তাহার অভ্যন্তরে দৃঢ়ভাবে বর্ত্তমান, সূক্ষ্মময় অধিষ্ঠাতা নিত্য-মুক্ত আনন্দময় পুরুষ আছেন। সেই নিত্যমুক্তি ও নিৰ্ম্মল আনন্দলাভ করা ধর্ম্মের উদ্দেশ্য। এই যে ধর্ম্মের উদ্দেশ্য, সেই বিজ্ঞানকল্পিত evolution-এরও উদ্দেশ্য। বিচারশক্তি ও তাহার অভাব পশু ও মনুষ্যের প্রকৃত ভেদ নহে। পশুর বিচারশক্তি আছে, কিন্তু পশুদেহে তাহার উৎকর্ষ হয় না। পশু মনুষ্যের প্রকৃত ভেদ এই যে শরীরের নিকট সম্পূর্ণ দাসত্ব স্বীকার পাশবিক অবস্থা, শরীর জয় ও আন্তরিক স্বাধীনতার চেষ্টাই মনুষ্যত্ব বিকাশ। এই স্বাধীনতাই ধর্ম্মের প্রধান উদ্দেশ্য, ইহাকেই মুক্তি বলে। এই মুক্ত্যর্থে আমরা অন্তঃকরণস্থ মনোময় প্রাণশরীরনেতাকে জ্ঞানদ্বারা চিনিতে কিম্বা কর্ম্মভক্তি-দ্বারা প্রাণ মন শরীর অর্পণ করিতে সচেষ্ট হই। "যোগস্থঃ কুরু কর্ম্মাণি" বলিয়া গীতার যে প্রধান উপদেশ এই স্বাধীনতাই সেই গীতোক্ত যোগ। আন্তরিক সুখদুঃখ যখন বাহ্যিক শুভাশুভ সম্পদ-বিপদকে আশ্রয় না করিয়া স্বয়ংজাত, স্বয়ংপ্রেরিত, স্বসীমাবদ্ধ হয়, তখন মনুষ্যের সাধারণ অবস্থার বিপরীত অবস্থা হয়, বাহ্যিক জীবন আন্তরিক জীবনের অনুযায়ী করা যায়, কর্ম্মবন্ধন শিথিল হয়। গীতার আদর্শ পুরুষ কর্ম্মফলে আসক্তি ত্যাগ করিয়া পুরুষোত্তমে কর্ম্মসন্ন্যাস করেন। তিনি "দুঃখেষ্বনুদ্বিগ্নমনাঃ সুখেষু বিগত-স্পৃহঃ" আন্তরিক স্বাতন্ত্র্য লাভ করিয়া আত্মরতি ও আত্মসন্তুষ্ট হইয়া থাকেন। তিনি প্রাকৃত লোকের ন্যায় সুখলালসায় দুঃখভয়ে কাহারও আশ্রিত হন না, পরের দত্ত সুখ-দুঃখ গ্রহণ করেন না, অথচ কর্ম্মভোগ করেন না। বরং মহাসংযমী মহাপ্রতাপান্বিত দেবাসুর যুদ্ধে রাগ ভয় ক্রোধাতীত মহারথী হইয়া ভগবৎ প্রেরিত যে কর্ম্মযোগী রাষ্ট্রবিপ্লব ধর্ম্মবিপ্লব অথবা প্রতিষ্ঠিত রাজ্য ধর্ম্মসমাজ রক্ষা করিয়া নিষ্কাম ভাবে ভগবৎকর্ম্ম সুসম্পন্ন করেন, তিনি গীতার শ্রেষ্ঠ পুরুষ।

আধুনিক যুগে আমরা নূতন পুরাতনের সন্ধিস্থলে উপস্থিত। মানুষ বরাবরই তাঁহার গন্তব্যস্থানে অগ্রসর হইতেছেন, সময়ে সময়ে সমতল ভূমি ত্যাগ করিয়া উচ্চে আরোহণ করিতে হয়, এবং সেইরূপ আরোহণ সময়ে রাজ্যে সমাজে ধর্ম্মে জ্ঞানে বিপ্লব হয়। বর্ত্তমানকালে স্থূল হইতে সূক্ষ্মে আরোহণ

করিবার উদ্যোগ চলিতেছে। পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণ স্থূলজগতের পুঙ্খানুপুঙ্খ পরীক্ষা ও নিয়ম নির্দ্ধারণ করায় আরোহণ মার্গের চতুঃপার্শ্বস্থ সমতল ভূমি পরিষ্কার হইয়াছে। সূক্ষ্মজগতের বিশাল রাজ্যে পাশ্চাত্য জ্ঞানীদিগের প্রথম পদক্ষেপ হইতেছে, অনেকের মন সেই রাজ্য জয়ের আশায় প্রলুব্ধ। ইহা ভিন্ন অন্য অন্য লক্ষণ দেখা যাইতেছে—যেমন অল্প দিনে থিয়সফির বিস্তার, আমেরিকায় বেদান্তের আদর, পাশ্চাত্য দর্শনশাস্ত্রে ও চিন্তাপ্রণালীতে ভারতবর্ষের পরোক্ষভাবে কিঞ্চিৎ আধিপত্য ইত্যাদি। কিন্তু সর্ব্বশ্রেষ্ঠ লক্ষণ ভারতের আকস্মিক ও আশাতীত উত্থান। ভারতবাসী জগতের গুরুস্থান অধিকার করিয়া নূতন যুগ প্রবর্ত্তন করিতে উঠিতেছেন। তাঁহার সাহায্যে বঞ্চিত হইলে পাশ্চাত্যগণ উন্নতি-চেষ্টায় সিদ্ধকাম হইতে পারিবেন না। যেমন আন্তরিক জীবনবিকাশের সর্ব্বপ্রধান উপায়স্বরূপ ব্রহ্মজ্ঞান তত্ত্বজ্ঞান ও যোগাভ্যাসে ভারত ভিন্ন অন্য কোন দেশ উৎকর্ষলাভ করে নাই, তেমনই মনুষ্য-জাতির প্রয়োজনীয় চিত্তশুদ্ধি ইন্দ্রিয়সংযম ব্রহ্মতেজ তপঃক্ষমতা ও নিষ্কাম কর্ম্মযোগশিক্ষা ভারতেরই সম্পত্তি। বাহ্য সুখদুঃখকে তাচ্ছিল্য করিয়া আন্তরিক স্বাধীনতা অর্জ্জন করা ভারতবাসীরই সাধ্য, নিষ্কাম কর্ম্মে ভারত-বাসীই সমর্থ, অহঙ্কার-বর্জ্জন ও কর্ম্মে নির্লিপ্ততা তাঁহারই শিক্ষা ও সভ্যতার চরম উদ্দেশ্য বলিয়া জাতীয় চরিত্রে বীজরূপে নিহিত।

এই কথার যাথার্থ্য প্রথম আলিপুর জেলে অনুভব করিলাম। এই জেলে প্রায়ই চোর ডাকাত হত্যাকারী থাকে। যদিও কয়েদীর সঙ্গে আমাদের কথা কহা নিষিদ্ধ, তথাপি কার্য্যতঃ এই নিয়ম সম্পূর্ণ পালন করা হইত না, তাহা ছাড়া রাঁধুনি পানিওয়ালা ঝাড়ুদার মেহতর প্রভৃতি, যাহাদের সংস্রবে না আসিলে নয়, তাহাদের সঙ্গে অনেক সময় অবাধে বাক্যালাপ হইত। যাঁহারা আমার এক অপরাধে অপরাধী বলিয়া ধৃত, তাঁহারাও নৃশংস হত্যাকারীর দল প্রভৃতি দুঃশ্রাব্য বিশেষণে কলঙ্কিত ও নিন্দিত। যদি কোনও স্থানে ভারতবাসীর চরিত্র ঘৃণার চক্ষে দেখিতে হয়, যদি কোন অবস্থায় তাহার নিকৃষ্ট অধম ও জঘন্য ভাবের পরিচয় পাওয়া সম্ভব হয়, তবে আলিপুর জেলই সেই স্থান, আলিপুরে কারাবাসই সেই নিকৃষ্ট হীন অবস্থা। আমি এই স্থানে এই অবস্থায় বার মাস কাটাইলাম। এই বারমাস অনুভবের ফলে, ভারতবাসীর শ্রেষ্ঠতা সম্বন্ধে দৃঢ় ধারণা, মনুষ্য চরিত্রের উপর দ্বিগুণ ভক্তি এবং স্বদেশের ও মনুষ্যজাতির ভবিষ্যৎ উন্নতি ও কল্যাণের দশগুণ আশা লইয়া কর্ম্মক্ষেত্রে ফিরিয়া আসিয়াছি। ইহা আমার স্বভাবজাত optimism অথবা অতিরিক্ত বিশ্বাসের ফল নহে। শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল বক্সার জেলে ইহা অনুভব করিয়া আসিয়াছিলেন, আলিপুর জেলে ভূতপূর্ব্ব ডাক্তার ডেলি সাহেবও ইহা সমর্থন করিতেন। ডেলি সাহেব মনুষ্যচরিত্রে অভিজ্ঞ সহৃদয় ও বিচক্ষণ লোক, মনুষ্য চরিত্রের নিকৃষ্ট ও জঘন্য বৃত্তি সকল প্রত্যহ তাঁহার সম্মুখে বিদ্যমান, অথচ তিনি আমাকে বলিতেন, "ভারতের ভদ্রলোক বা ছোটলোক,

সমাজের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি বা জেলের কয়েদী যতই দেখি ও শুনি, আমার এই ধারণা দৃঢ় হয় যে চরিত্রে ও গুণে তোমরা আমাদের চেয়ে ঢের উঁচু। এই দেশের কয়েদী ও য়ুরোপের কয়েদীতে আকাশ-পাতাল তফাৎ। এই ছেলেদের দেখে আমার এই ধারণা আরও দৃঢ় হয়েছে। এদের আচরণ চরিত্র ও নানা সদ্‌গুণ দেখে কে কল্পনা করতে পারে যে এরা anarchist বা হত্যাকারী। তাদের মধ্যে ক্রূরতা উদ্দামভাব অধীরতা বা ধৃষ্টতা কিছুমাত্র না দেখে সব উল্টা গুণই দেখি।" অবশ্যই জেলে চোর ডাকাত সাধুসন্ন্যাসী হয় না। ইংরাজের জেল চরিত্র শুধরাইবার স্থান নহে, বরং সাধারণ কয়েদীর পক্ষে চরিত্রহানি ও মনুষ্যত্বনাশের উপায়মাত্র। তাহারা যে চোর ডাকাত খুনী ছিল, সেই চোর ডাকাত খুনীই থাকে, জেলে চুরি করে, শক্ত নিয়মের মধ্যেও নেশা করে, জুয়াচুরি করে। তাহা হইলে কি হইবে, ভারতবাসীর মনুষ্যত্ব গিয়াও যায় না। সামাজিক অবনতিতে পতিত, মনুষ্যত্বনাশের ফলে নিষ্পেষিত, বাহিরে কালিমা কদর্য্যভাব কলঙ্ক বিকৃতি, তথাপি ভিতরে সেই লুপ্তপ্রায় মনুষ্যত্ব ভারতবাসীর মজ্জাগত সদ্‌গুণে লুকাইয়া আত্মরক্ষা করে, পুনঃ পুনঃ কথায় ও আচরণে তাহা প্রকাশ পায়। যাঁহারা উপরের কাদাটুকু দেখিয়া ঘৃণায় মুখ ফিরাইয়া লন, তাঁহারাই বলিতে পারেন যে ইহাদের মধ্যে মনুষ্যত্বের লেশমাত্র দেখিতে পাই নাই। কিন্তু যিনি সাধুতার অহঙ্কার ত্যাগ করিয়া নিজ সহজসাধ্য স্থির-দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করেন, তিনি এই মতে কখনও মত দিবেন না। ছয় মাস কারাবাসের পরে শ্রীযুত বিপিনচন্দ্র পাল বক্‌সার জেলের চোর ডাকাতের মধ্যেই সর্ব্বঘটে নারায়ণকে দর্শন করিয়া উত্তরপাড়ার সভায় মুক্তকণ্ঠে এই কথা স্বীকার করিয়াছিলেন। আমিও আলিপুর জেলেই হিন্দুধর্ম্মের এই মূল-তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলাম, চোর ডাকাত খুনীর মধ্যে সর্ব্বপ্রথম মনুষ্য দেহে নারায়ণকে উপলব্ধি করিলাম।

এই দেশে কত শত নিরপরাধ ব্যক্তি দীর্ঘকাল জেলরূপ নরকবাস ভোগ দ্বারা পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত দুষ্কর্ম্মফল লাঘব করিয়া তাঁহাদের স্বর্গপথ পরিষ্কার করিতেছেন। কিন্তু সাধারণ পাশ্চাত্যবাসীগণ যাহারা ধর্ম্মভাব দ্বারা পূত ও দেবভাবাপন্ন নহে, তাহারা এইরূপ পরীক্ষায় কতদূর উত্তীর্ণ হয়, যাঁহারা পাশ্চাত্য দেশে রহিয়াছেন বা পাশ্চাত্য চরিত্র-প্রকাশক সাহিত্য পড়িয়াছেন, তাঁহারাই সহজে অনুমান করিতে পারেন। এরূপ স্থলে হয়ত তাঁহাদের নিরাশা-পীড়িত ক্রোধ ও দুঃখের অশ্রুজলপ্লুত হৃদয় পার্থিব নরকের ঘোর অন্ধকারে এবং সহবাসীদের সংস্রবে পড়িয়া তাহাদেরই ক্রূরতা ও নীচবৃত্তি আশ্রয় করে;—নয়ত দুর্ব্বলতার নিরতিশয় নিষ্পেষণে বল বুদ্ধি হীন হইয়া তাহাতে মনুষ্যের নষ্টাবশেষ মাত্র অবশিষ্ট থাকে।

আলিপুরের একজন নিরপরাধীর কথা বলি। এ ব্যক্তি ডাকাতিতে লিপ্ত বলিয়া দশ বৎসর সশ্রম কারাবাসে দণ্ডিত। জাতে গোয়ালা, অশিক্ষিত, লেখা-পড়ার ধার ধারে না, ধর্ম্মসম্বলের মধ্যে ভগবানে আস্থা ও আর্য্যশিক্ষাসুলভ

ধৈর্য্য ও অন্যান্য সদ্‌গুণ ইহাতে বিদ্যমান। এই বৃদ্ধের ভাব দেখিয়া আমার বিদ্যা ও সহিষ্ণুতার অহঙ্কার চূর্ণ হইয়া গেল। বৃদ্ধের নয়নে সর্ব্বদা প্রশান্ত সরল মৈত্রীভাব বিরাজিত, মুখে সর্ব্বদা অমায়িক প্রীতিপূর্ণ আলাপ। সময় সময় নিরপরাধে কষ্টভোগের কথা পাড়েন, স্ত্রী-ছেলেদের কথা বলেন, কবে ভগবান কারামুক্তি দিয়া স্ত্রী-ছেলেদের মুখদর্শন করাইবেন, এই ভাবও প্রকাশ করেন, কিন্তু কখনও তাঁহাকে নিরাশ বা অধীর দেখি নাই। ভগবানের কৃপাপেক্ষায় ধীরভাবে জেলের কর্ম্ম সম্পন্ন করিয়া দিন যাপন করিতেছেন। বৃদ্ধের যত চেষ্টা ও ভাবনা নিজের জন্যে নহে, পরের সুখ-সুবিধা সংক্রান্ত। দয়া ও দুঃখীর প্রতি সহানুভূতি তাঁহার কথায় কথায় প্রকাশ পায়, পরসেবা তাঁহার স্বভাব-ধর্ম্ম। নম্রতায় এই সকল সদ্‌গুণ আরও ফুটিয়া উঠিয়াছে। আমা হইতে সহস্রগুণ উচ্চ হৃদয় বুঝিয়া এই নম্রতায় আমি সর্ব্বদা লজ্জিত হইতাম, বৃদ্ধের সেবা গ্রহণ করিতে সংকোচ হইত, কিন্তু তিনি ছাড়েন না, তিনি সর্ব্বদা আমার সুখ-সোয়াস্তির জন্যে চিন্তিত। যেমন আমার উপর তেমনই সকলের উপর-- বিশেষ নিরপরাধ ও দুঃখীজনের প্রতি তাঁহার দয়াদৃষ্টি বিনীত সেবা-সম্মান আরো অধিক। অথচ মুখে ও আচরণে কেমন একটি স্বাভাবিক প্রশান্ত গাম্ভীর্য্য ও মহিমা প্রকাশিত। দেশের প্রতিও ইঁহার যথেষ্ট অনুরাগ ছিল। এই বৃদ্ধ কয়েদীর দয়াদাক্ষিণ্যপূর্ণ শ্বেতশ্মশ্রুমণ্ডিত সৌম্যমূর্ত্তি চিরকাল আমার স্মৃতিপটে অঙ্কিত থাকিবে। এই অবনতির দিনেও ভারতবর্ষের চাষার মধ্যে--আমরা যাহাদের অশিক্ষিত ছোটলোক বলি,-- তাহাদের মধ্যে এইরূপ হিন্দুসন্তান পাওয়া যায়, ইহাতেই হিন্দুধর্ম্মের গৌরব, আর্য্যশিক্ষার অতুল গুণপ্রকাশ এবং ইহাতেই ভারতের ভবিষ্যৎ আশাজনক। শিক্ষিত যুবকমণ্ডলী ও অশিক্ষিত কৃষক সম্প্রদায় এই দুইটি শ্রেণীতেই ভারতের ভবিষ্যৎ নিহিত, ইহাদের মিলনেই ভবিষ্যৎ আর্য্যজাতি গঠিত হইবে।

উপরে একটি অশিক্ষিত চাষার কথা বলিলাম, এখন দুইজন শিক্ষিত যুবকের কথা বলি। ইঁহারা সাত বৎসর সশ্রম কারাবাস দণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন। ইঁহারা হ্যারিসন রোডের কবিরাজদ্বয়, নগেন্দ্রনাথ ও ধরণী। ইঁহারাও যেরূপ শান্তভাবে, যেরূপ সন্তুষ্টমনে, এই আকস্মিক বিপত্তি, এই অন্যায় রাজদণ্ড সহ্য করিতেন, তাহা দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হইত। কখনও তাঁহাদের মুখে ক্রোধদুষ্ট বা অসহিষ্ণুতাপ্রকাশক একটি কথা শুনি নাই। যাঁহাদের দোষে জেলরূপ নরকে যৌবনকাল কাটাইতে হইল, তাঁহাদের প্রতি যে লেশমাত্র ক্রোধ তিরস্কারভাব বা বিরক্তি পর্য্যন্ত আছে, তাহার কোন লক্ষণ কখনও দেখিতে পাই নাই। তাঁহারা আধুনিক শিক্ষার গৌরবস্থল পাশ্চাত্যভাষায় ও পাশ্চাত্য-বিদ্যায় অভিজ্ঞতাবঞ্চিত, মাতৃভাষাই ইঁহাদের সম্বল, কিন্তু ইংরাজীশিক্ষালব্ধ সম্প্রদায়ের মধ্যে তাঁহাদের তুল্য কম লোক দেখিয়াছি। দুইজনেই মানুষের নিকট আক্ষেপ কিংবা বিধাতার নিকট নালিশ না করিয়া সহাস্য মুখে নতমস্তকে দণ্ড গ্রহণ করিয়াছেন। দুটি ভাইই সাধক কিন্তু প্রকৃতি বিভিন্ন। নগেন্দ্র

ধীর প্রকৃতি, গম্ভীর, বুদ্ধিমান। হরিকথা ও ধর্ম্মবিষয়ে আলাপ অত্যন্ত ভালবাসিতেন। যখন আমাদিগকে নির্জ্জন কারাবাসে রাখা হইল তখন জেলের কর্তৃপক্ষ জেলের খাটুনি সমাপ্তে আমাদিগকে বই পড়িবার অনুমতি দিলেন। নগেন্দ্র ভগবদ্‌গীতা পড়িতে চাহিয়া বাইবেল পাইয়াছিলেন। বাইবেল পড়িয়া তাঁহার মনে কি কি ভাবের উদয় হয়, কাঠগড়ায় বসিয়া আমার নিকট তাহার বর্ণনা করিতেন। নগেন্দ্র গীতা পড়েন নাই, তথাপি আশ্চর্য্যের সহিত দেখিলাম বাইবেলের কথা না বলিয়া গীতার শ্লোকার্থ বলিতেছেন—এমন কি এক একবার মনে হইত যে ভগবদ্‌গুণাত্মক মহৎ উক্তিসকল কুরুক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণ-মুখ-নিঃসৃত উক্তিগুলি সেই বাসুদেব মুখপদ্ম হইতে এই আলিপুরের কাঠগড়ায় আবার নিঃসৃত হইতেছে। গীতা না পড়িয়া বাইবেল গীতার সমতাবাদ, কর্ম্মফলত্যাগ, সর্ব্বত্র ঈশ্বর দর্শন ইত্যাদি ভাব উপলব্ধি করা সামান্য সাধনার লক্ষণ নহে। ধরণী নগেন্দ্রের ন্যায় বুদ্ধিমান নন, কিন্তু বিনীত ও কোমল প্রকৃতি, স্বভাবতঃই ভক্ত। তিনি সর্ব্বদা মাতৃধ্যানে বিভোর, তাঁহার মুখের প্রসন্নতা, সরল হাস্য ও কোমল ভক্তিভাব দেখিয়া জেলের জেলত্ব উপলব্ধি করা কঠিন হইয়া পড়িত। ইঁহাদের দেখিয়া কে বলিতে পারে, বাঙ্গালী হীন অধম? এই শক্তি, এই মনষ্যত্ব, এই পবিত্র অগ্নি ভস্মরাশিতে লুক্কায়িত আছে মাত্র।

ইঁহারা উভয়েই নিরপরাধ। বিনা দোষে কারাবদ্ধ হইয়াও নিজগুণে বা শিক্ষাবলে বাহ্য সুখদুঃখের আধিপত্য অস্বীকার করিয়া আন্তরিক জীবনের স্বাধীনতা রক্ষা করিতে সক্ষম হইয়াছেন। কিন্তু যাঁহারা অপরাধী, তাঁহাদের মধ্যেও জাতীয় চরিত্রের সদ্‌গুণ বিকাশ পাইত। বার মাস আলিপুরে ছিলাম, দুয়েকজন ভিন্ন যত কয়েদী, যত চোর ডাকাত খুনীর সঙ্গে আমাদের সংস্রব ঘটিয়াছিল, সকলের নিকটেই আমরা সদ্ব্যবহার ও অনুকূলতা পাইতাম। আধুনিক-শিক্ষা-দূষিত আমাদের মধ্যে বরঞ্চ এসকল গুণের অভাব দেখা যায়। আধুনিক শিক্ষার অনেক গুণ থাকিতে পারে কিন্তু সৌজন্য ও নিঃস্বার্থ পরসেবা সেই গুণের মধ্যগত নহে। যে দয়া সহানুভূতি আর্যশিক্ষার মূল্যবান অঙ্গ, তাহা এই চোর-ডাকাতের মধ্যেও দেখিতাম। মেহতর ঝাড়ুদার পানিওয়ালাকে বিনা দোষে আমাদের সঙ্গে সঙ্গে নির্জ্জন কারাবাসের দুঃখকষ্ট কতক-পরিণামে অনুভব করিতে হইত, কিন্তু তাহাতে একজনও আমাদের উপর অসন্তুষ্টি বা ক্রোধ প্রকাশ করে নাই। দেশী জেলরক্ষকদের নিকট তাহারা মাঝে মাঝে দুঃখ প্রকাশ করিত বটে, কিন্তু প্রসন্নমুখে আমাদের কার্য্য করিয়া যাইত, এবং ভগবানের নিকট আমাদের কারামুক্তি প্রার্থনা করিত। একজন মুসলমান কয়েদী অভিযুক্তদিগকে নিজের ছেলেদের ন্যায় ভালবাসিতেন, বিদায় লইবার সময় তিনি অশ্রুজল সম্বরণ করিতে পারেন নাই। দেশের জন্যে এই লাঞ্ছনা ও কষ্টভোগ বলিয়া অন্য সকলকে দেখাইয়া দুঃখ করিতেন, "দেখ, ইহারা ভদ্রলোক, ধনী লোকের সন্তান, গরীব-দুঃখীকে পরিত্রাণ করিতে গিয়া ইহাদের এই দুর্দ্দশা।" যাঁহারা পাশ্চাত্য সভ্যতার বড়াই করেন, তাঁহাদের

জিজ্ঞাসা করি, ইংলণ্ডের জেলে নিম্নশ্রেণীর কয়েদী, চোর ডাকাত খুনীর এই-রূপ আত্মসংযম দয়া-দাক্ষিণ্য কৃতজ্ঞতা পরার্থে ভগবদ্‌ভক্তি কি দেখা যায়? প্রকৃতপক্ষে য়ুরোপ ভোক্তৃভূমি, ভারত দাতৃভূমি। দেব ও অসুর বলিয়া গীতায় দুই শ্রেণীর জীব বর্ণিত আছে। ভারতবাসী স্বভাবতঃ দেবপ্রকৃতি, পাশ্চাত্যগণ স্বভাবতঃ অসুরপ্রকৃতি। কিন্তু এই ঘোর কলিতে পড়িয়া তমোভাবের প্রাধান্য-বশতঃ আর্য্যশিক্ষার অবলোপে দেশের অবনতি, সমাজের অবনতিতে ও ব্যক্তিগত অবনতিতে আমরা নিকৃষ্ট আসুরিকবৃত্তি সঞ্চয় করিতেছি আর পাশ্চাত্যগণ অন্যদিকে জাতীয় উন্নতি ও মনুষ্যত্বের ক্রমবিকাশের গুণে দেবভাব অর্জ্জন করিতেছেন। ইহা সত্ত্বেও তাহাদের দেবভাবে কতকটা অসুরত্ব এবং আমাদের আসুরিক ভাবের মধ্যেও দেবভাব অস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান। তাহাদের মধ্যে যে শ্রেষ্ঠ, সেও অসুরত্ব সম্পূর্ণ হারায় না। নিকৃষ্টে নিকৃষ্টে যখন তুলনা করি, ইহার যথার্থতা তখন অতি স্পষ্টরূপে বোঝা যায়।

এই সম্বন্ধে অনেক কথা লিখিবার আছে, প্রবন্ধের অতিদীর্ঘতার ভয়ে লিখিলাম না। তবে জেলে যাঁহাদের আচরণে এই আন্তরিক স্বাধীনতা দর্শন করিয়াছি, তাঁহারা এই দেবভাবের চরম দৃষ্টান্ত। এই সম্বন্ধে পরবর্ত্তী প্রবন্ধে লিখিবার ইচ্ছা রহিল।

আর্য আদর্শ ও গুণত্রয়

'কারাগৃহ ও স্বাধীনতা'-শীর্ষক প্রবন্ধে আমি কয়েকজন নিরপরাধী কয়েদীর মানসিক ভাব বর্ণনা করিয়া ইহাই প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিয়াছি যে, আর্য্যশিক্ষার গুণে কারাবাসেও ভারতবাসীর আন্তরিক-স্বাধীনতারূপ মহামূল্য পৈতৃকসম্পত্তি বিনষ্ট হয় না--উপরন্তু ঘোর অপরাধীর মধ্যেও সেই সহস্রবর্ষ সঞ্চিত আর্য্যচরিত্রগত দেবভাবও ভগ্নাবশিষ্টরূপে বর্ত্তমান থাকে। আর্য্যশিক্ষার মূলমন্ত্র সাত্ত্বিকভাব। যে সাত্ত্বিক, সে বিশুদ্ধ। সাধারণতঃ মনুষ্য-মাত্রেই অশুদ্ধ। রজোগুণের প্রাবল্যে, তমোগুণের ঘোর নিবিড়তায় এই অশুদ্ধি পরিপুষ্ট ও বর্দ্ধিত হয়। মনের মালিন্য দুই প্রকার,--জড়তা, বা অপ্রবৃত্তি-জনিত মালিন্য; ইহা তমোগুণপ্রসূত। দ্বিতীয়,--উত্তেজনা বা কুপ্রবৃত্তিজনিত মালিন্য ; ইহা রজোগুণপ্রসূত। তমোগুণের লক্ষণ অজ্ঞানমোহ, বুদ্ধির স্থূলতা, চিন্তার অসংলগ্নতা, আলস্য, অতিনিদ্রা, কর্ম্মে আলস্যজনিত বিরক্তি, নিরাশা, বিষাদ, ভয়, এক কথায় যাহা কিছু নিশ্চেষ্টতার পরিপোষক তাহাই। জড়তা ও অপ্রবৃত্তি অজ্ঞানের ফল, উত্তেজনা ও কুপ্রবৃত্তি ভ্রান্তজ্ঞানসম্ভূত। কিন্তু তমো-মালিন্য অপনোদন করিতে হইলে রজোগুণের উদ্রেক দ্বারাই তাহা দূর করিতে হয়। রজোগুণই প্রবৃত্তির কারণ এবং প্রবৃত্তিই নিবৃত্তির প্রথম সোপান। যে জড়, সে নিবৃত্ত নয়,--জড়ভাব জ্ঞানশূন্য; আর জ্ঞানই নিবৃত্তির মার্গ। কামনা-শূন্য হইয়া যে কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়, সে নিবৃত্ত ; কর্ম্মত্যাগ নিবৃত্তি নয়। সেই জন্য ভারতের ঘোর তামসিক অবস্থা দেখিয়া স্বামী বিবেকানন্দ বলিতেন, "রজোগুন চাই, দেশে কর্ম্মবীর চাই, প্রবৃত্তির প্রচণ্ড স্রোত বহুক। তাহাতে যদি পাপও আসিয়া পড়ে, তাহাও এই তামসিক নিশ্চেষ্টতা অপেক্ষা সহস্র গুণে ভাল।"

সত্যই আমরা ঘোর তমোমধ্যে নিমগ্ন হইয়া সত্ত্বগুণের দোহাই দিয়া মহা-সাত্ত্বিক সাজিয়া বড়াই করিতেছি। অনেকের এই মত দেখিতে পাই যে, আমরা সাত্ত্বিক বলিয়াই রাজসিক জাতিসকল দ্বারা পরাজিত, সাত্ত্বিক বলিয়া এইরূপ অবনত ও অধঃপতিত। তাঁহারা এই যুক্তি দেখাইয়া খৃষ্টধর্ম্ম হইতে হিন্দুধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপন্ন করিতে সচেষ্ট। খৃষ্টানজাতি প্রত্যক্ষফলবাদী, তাঁহারা ধর্ম্মের ঐহিক ফল দেখাইয়া ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদন করিতে চেষ্টা করেন; তাঁহারা বলেন--খৃষ্টান জাতিই জগতে প্রবল, অতএব খৃষ্টান ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম। আর আমাদের মধ্যে অনেকে বলেন--ইহা ভ্রম, ঐহিক ফল দেখিয়া ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা নির্ণয় করা যায় না, পারলৌকিক ফল দেখিতে

হয়, হিন্দুরা অধিক ধাৰ্ম্মিক বলিয়া, অসুর প্রকৃতি বলবান পাশ্চাত্যজাতির অধীন হইয়াছে। কিন্তু এই যুক্তির মধ্যে আর্য্যজ্ঞানবিরোধী ঘোর ভ্রম নিহিত। সত্ত্বগুণ কখনই অবনতির কারণ হইতে পারে না; এমনকি সত্ত্বপ্রধান জাতি দাসত্ব-শৃঙ্খলিত হইয়া থাকিতে পারে না। ব্রহ্মতেজই সত্ত্বগুণের মুখ্যফল, ক্ষত্রতেজ ব্রহ্মতেজের ভিত্তি। আঘাত পাইলে শান্ত ব্রহ্মতেজ হইতে ক্ষত্রতেজের স্ফুলিঙ্গ নির্গত হয়, চারিদিক জ্বলিয়া উঠে। যেখানে ক্ষত্রতেজ নাই, সেখানে ব্রহ্মতেজ টিকিতে পারে না। দেশে যদি একজন প্রকৃত ব্রাহ্মণ থাকে সে এক শ' ক্ষত্রিয় সৃষ্টি করে। দেশের অবনতির কারণ সত্ত্বগুণের আতিশয্য নয়, রজোগুণের অভাব, তমোগুণের প্রাধান্য। রজোগুণের অভাবে আমাদের অন্তর্নিহিত সত্ত্ব ম্লান হইয়া তমোমধ্যে গুপ্ত হইয়া পড়িল। আলস্য, মোহ, অজ্ঞান, অপ্রবৃত্তি, নিরাশা, বিষাদ, নিশ্চেষ্টার সঙ্গে সঙ্গে দেশের দুৰ্দ্দশা অবনতিও বৰ্দ্ধিত হইতে লাগিল। এই মেঘ প্রথমে লঘু ও বিরল ছিল, কালের গতিতে ক্রমশঃ এতদূর নিবিড়তর হইয়া পড়িল, অজ্ঞান অন্ধকারে ডুবিয়া আমরা এমন নিশ্চেষ্ট ও মহদাকাঙ্ক্ষাবর্জিত হইয়া পড়িলাম যে, ভগবৎপ্রেরিত মহাপুরুষগণের উদয়েও সেই অন্ধকার পূর্ণ তিরোহিত হইল না। তখন সূর্য্য-ভগবান রজোগুণ-জনিত প্রবৃত্তি দ্বারা দেশরক্ষার সঙ্কল্প করিলেন।

জাগ্রত রজঃশক্তি প্রচণ্ডভাবে কার্য্যকরী হইলে তমঃ পলায়নোদ্যত হয় বটে কিন্তু অন্যদিকে স্বেচ্ছাচার, কুপ্রবৃত্তি ও উদ্দাম উচ্ছৃঙ্খলতা প্রভৃতি আসুরিক ভাব আসিবার আশঙ্কা। রজঃশক্তি যদি স্ব স্ব প্রেরণায় উন্মত্ততার বিশাল প্রবৃত্তির উদরপূরণকেই লক্ষ্য করিয়া কার্য্য করে, তাহা হইলে এই আশঙ্কার যথেষ্ট কারণও আছে। রজোগুণ উচ্ছৃঙ্খলভাবে স্বপথগামী হইলে অধিককাল টিকিতে পারে না, ক্লান্তি আসে, তমঃ আসে, প্রচণ্ড ঝটিকার পরে আকাশ নিৰ্ম্মল পরিষ্কার না হইয়া মেঘাচ্ছন্ন বায়ুস্পন্দনরহিত হইয়া পড়ে। রাষ্ট্রবিপ্লবের পরে ফ্রান্সের এই পরিণাম হইয়াছে। সেই রাষ্ট্রবিপ্লবে রজোগুণের ভীষণ প্রাদুর্ভাব, বিপ্লবান্তে তামসিকতার অল্পাধিক পুনরুত্থান, আবার রাষ্ট্রবিপ্লব, আবার ক্লান্তি, শক্তিহীনতা, নৈতিক অবনতি, ইহাই গত শতবর্ষে ফ্রান্সের ইতিহাস। যতবার সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতারূপ আদর্শজনিত সাত্ত্বিক প্রেরণা ফ্রান্সের প্রাণে জাগিয়াছে, ততবারই ক্রমশঃ রজোগুণ প্রবল হইয়া সত্ত্বসেবা-বিমুখ আসুরিকভাবে পরিণতি লাভ করিয়া স্বপ্রবৃত্তিপূরণে যত্নবান হইয়াছে। ফলতঃ, তমোগুণের পুনরাবির্ভাবে ফ্রান্স তাহার পূৰ্ব্বসঞ্চিত মহাশক্তি হারাইয়া ম্রিয়মাণ বিষম অবস্থায় হরিশ্চন্দ্রের মত না স্বর্গে না মর্ত্ত্যে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। এইরূপ পরিণাম এড়াইবার একমাত্র উপায় প্রবল রজঃশক্তিকে সত্ত্বসেবায় নিযুক্ত করা। যদি সাত্ত্বিকভাব জাগ্রত হইয়া রজঃশক্তির চালক হয়, তাহা হইলে তমোগুণের পুনঃ প্রাদুর্ভাবের ভয়ও নাই, উদ্দাম শক্তিও শৃঙ্খলিত নিয়ন্ত্রিত হইয়া উচ্চ আদর্শের বশে দেশের ও জগতের হিতসাধন করে। সত্ত্বোদ্রেকের উপায় ধৰ্ম্মভাব—স্বার্থকে ডুবাইয়া পরার্থে সমস্ত শক্তি অর্পণ—ভগবানকে

আত্মসমর্পণ করিয়া সমস্ত জীবনকে এক মহা ও পবিত্র যজ্ঞে পরিণত করা। গীতায় কথিত আছে, সত্ত্বরজঃ উভয়ে তমঃ নাশ করে; একা সত্ত্ব কখন তমঃকে পরাজয় করিতে পারে না। সেইজন্য ভগবান অধুনা ধর্ম্মের পুনরুত্থান করাইয়া আমাদের অন্তর্নিহিত সত্ত্বকে জাগাইয়া পরে রজঃশক্তিকে দেশময় ছড়াইয়া দিয়াছেন। রামমোহন রায় প্রভৃতি ধর্ম্মোপদেশক মহাত্মাগণ সত্ত্বকে পুনরুদ্দীপিত করিয়া নবযুগ প্রবর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন। উনবিংশ শতাব্দীতে ধর্ম্মজগতে যেমন জাগরণ হইয়াছিল, রাজনীতি বা সমাজে তেমন হয় নাই। কারণ ক্ষেত্র প্রস্তুত ছিল না, সেইজন্য প্রচুর বীজ বপিত হইয়াও শস্য দেখা দেয় নাই। ইহাতেও ভারতবর্ষের উপর ভগবানের দয়া ও প্রসন্নতা বুঝা যায়। রাজসিক ভাবপ্রসূত জাগরণ কখনও স্থায়ী বা পূর্ণ কল্যাণপ্রদ হইতে পারে না। তৎপূর্ব্বে জাতির অন্তরে কতকাংশে ব্রহ্মতেজ উদ্দীপিত হওয়া আবশ্যক। সেইজন্য এতদিন রজঃশক্তির স্রোত রুদ্ধ ছিল। ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে রজঃশক্তির যে বিকাশ হইয়াছে তাহা সাত্ত্বিকভাব পূর্ণ। এই নিমিত্ত ইহাতে যে উদ্দামভাব দেখা গিয়াছে তাহাতেও আশঙ্কার বিশেষ কারণ নাই, কেননা ইহা রজঃসাত্ত্বিকের খেলা; এ খেলায় যাহা কিছু উদ্দাম বা উচ্ছৃঙ্খল ভাব তাহা অচিরে নিয়মিত ও শৃঙ্খলিত হইবেই। বাহ্যশক্তির দ্বারা নহে, ভিতরে যে ব্রহ্মতেজ, যে সাত্ত্বিক-ভাব, তাহা দ্বারাই ইহা বশীভূত ও নিয়মিত হইবে। ধর্ম্মভাব প্রচার করিয়া আমরা সেই ব্রহ্মতেজ ও সাত্ত্বিকভাবের পোষকতা করিতে পারি মাত্র।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি পরার্থে সর্ব্বশক্তি নিয়োগ করা সত্ত্বোদ্রেকের এক উপায়। আর আমাদের রাজনীতিক জাগরণে এই ভাবের যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। কিন্তু এইভাব রক্ষা করা কঠিন। যেমন ব্যক্তির পক্ষে কঠিন জাতির পক্ষে আরও কঠিন। পরার্থের মধ্যে স্বার্থ অলক্ষিতভাবে ছুটিয়া আসে এবং যদি আমাদের বুদ্ধি বিশুদ্ধ না হয়, এমন ভ্রমে পতিত হইতে পারি যে আমরা পরার্থের দোহাই দিয়া স্বার্থকে আশ্রয় করিয়া পরহিত, দেশহিত, মনুষ্যজাতির হিত ডুবাইব অথচ নিজের ভ্রম বুঝিতে পারিব না। ভগবৎসেবা সত্ত্বোদ্রেকের অন্য উপায়। কিন্তু সেই পথেও হিতে বিপরীত হইতে পারে, ভগবৎসান্নিধ্যরূপ আনন্দ পাইয়া আমাদের সাত্ত্বিক-নিশ্চেষ্টতা জন্মিতে পারে, সেই আনন্দের আস্বাদ ভোগ করিতে করিতে দুঃখকাতর দেশের প্রতি ও মানবজাতির সেবায় পশ্চাৎমুখ হইতে পারি। ইহাই সাত্ত্বিকভাবের বন্ধন। যেমন রাজসিক অহঙ্কার আছে, তেমনি সাত্ত্বিক অহঙ্কারও আছে। যেমন পাপ মানুষকে বদ্ধ করে, তেমনই পুণ্যও বদ্ধ করে। সম্পূর্ণ বাসনাশূন্য হইয়া অহঙ্কার ত্যাগ-পূর্ব্বক ভগবানকে আত্মসমর্পণ না করিলে পূর্ণ স্বাধীনতা নাই। এই দুটি অনিষ্ট ত্যাগ করিতে হইলে প্রথম বিশুদ্ধ বুদ্ধির দরকার। দেহাত্মক বুদ্ধি বর্জন করিয়া মানসিক স্বাধীনতা অর্জন করাই বুদ্ধি-শোধনের পূর্ব্ববর্ত্তী অবস্থা। মন স্বাধীন হইলে জীবের আয়ত্ত হয়, পরে মনকে জয় করিয়া বুদ্ধির আশ্রয়ে মানুষ স্বার্থের হাত হইতে অনেকটা পরিত্রাণ লাভ করে। ইহাতেও স্বার্থ

সম্পূর্ণভাবে আমাদিগকে ত্যাগ করে না। শেষ স্বার্থ মুমূক্ষুত্ব, পরদুঃখকে ভুলিয়া নিজের আনন্দে ভোর হইয়া থাকিবার ইচ্ছা। ইহাও ত্যাগ করিতে হয়। সর্ব্বভূতে নারায়ণকে উপলব্ধি করিয়া সেই সর্ব্বভূতস্থ নারায়ণের সেবা ইহার ঔষধ; ইহাই সত্ত্বগুণের পরাকাষ্ঠা। ইহা হইতেও উচ্চতর অবস্থা আছে, তাহা সত্ত্বগুণকেও অতিক্রম করিয়া গুণাতীত হইয়া সম্পূর্ণভাবে ভগবানকে আশ্রয় করা। গুণাতীত্যের বর্ণনা গীতায় কথিত আছে, যেমন--

নান্যং গুণেভ্যঃ কর্ত্তারং যদা দ্রষ্টাহনুপশ্যতি।
গুণেভ্যশ্চ পরং বেত্তি মদ্ভাবং সোহধিগচ্ছতি॥
গুণানেতানতীত্য ত্রীন্ দেহী দেহসমুদ্ভবান্।
জন্মমৃত্যুজরাদুঃখৈর্বিমুক্তোহমৃতমশ্নুতে॥
প্রকাশঞ্চ প্রবৃত্তিঞ্চ মোহমেব চ পাণ্ডব।
ন দ্বেষ্টি সংপ্রবৃত্তানি ন নিবৃত্তানি কাঙ্ক্ষতি॥
উদাসীনবদাসীনো গুণৈর্যো ন বিচাল্যতে।
গুণা বর্ত্তন্ত ইত্যেব যোহবতিষ্ঠতি নেঙ্গতে॥
সমদুঃখসুখঃ স্বস্থঃ সমলোষ্টাশ্মকাঞ্চনঃ।
তুল্যপ্রিয়াপ্রিয়ো ধীরস্তুল্যনিন্দাত্মসংস্তুতিঃ॥
মানাপমানয়োস্তুল্যস্তুল্যো মিত্রারিপক্ষয়োঃ।
সর্ব্বারম্ভপরিত্যাগী গুণাতীতঃ স উচ্যতে॥
মাঞ্চ যোহব্যভিচারেণ ভক্তিযোগেন সেবতে।
স গুণান্ সমতীত্যৈতান্ ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে॥

"যখন জীব সাক্ষী হইয়া গুণত্রয় অর্থাৎ ভগবানের ত্রৈগুণ্যময়ী শক্তিকেই একমাত্র কর্ত্তা বলিয়া দেখে এবং এই গুণত্রয়েরও উপর শক্তির প্রেরক ঈশ্বরকে জানিতে পারে, তখন সে-ই ভগবৎ সাধর্ম্ম্য লাভ করে। তখন দেহস্থ জীব স্থূল ও সূক্ষ্ম এই দুই প্রকার দেহসম্ভূত গুণত্রয়কে অতিক্রম করিয়া জন্মমৃত্যু জরা-দুঃখ হইতে বিমুক্ত হইয়া অমরত্ব ভোগ করে। সত্ত্বজনিত জ্ঞান, রজোজনিত প্রবৃত্তি বা তমোজনিত নিদ্রা নিশ্চেষ্টা ভ্রমস্বরূপ মোহ আসিলে বিরক্ত হয় না, এই গুণত্রয়ের আগমন-নির্গমনে সমান ভাব রাখিয়া উদাসীনের ন্যায় স্থির হইয়া থাকে, গুণগ্রাম তাহাকে বিচলিত করিতে পারে না, এই সবই গুণের স্বধর্ম্মজাত বৃত্তি বলিয়া দৃঢ় থাকে। যাহার পক্ষে সুখ-দুঃখ সমান, প্রিয়-অপ্রিয় সমান, নিন্দা-স্তুতি সমান, কাঞ্চন-লোষ্ট্র উভয়ই প্রস্তরের তুল্য, যে ধীর-স্থির, নিজের মধ্যে অটল, যাহার নিকট মান-অপমান একই, মিত্রপক্ষ ও শত্রুপক্ষ সমান প্রিয়, যে স্বয়ংপ্রেরিত হইয়া কোন কার্য্যারম্ভ করে না, সকল ধর্ম্ম ভগবানকে সমর্পণ করিয়া তাঁহারই প্রেরণায় কর্ম্ম করে, তাহাকেই গুণাতীত বলে। যে আমাকে নির্দ্দোষ ভক্তিযোগে সেবা করে, সে-ই এই তিন গুণকে অতিক্রম করিয়া ব্রহ্মপ্রাপ্তির উপযুক্ত হয়।"

এই গুণাতীত অবস্থা লাভ সকলের সাধ্য না হইলেও তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী

অবস্থা লাভ সত্ত্বপ্রধান পুরুষের অসাধ্য নহে। সাত্ত্বিক অহঙ্কারকে ত্যাগ করিয়া জগতের সকল কার্য্যে ভগবানের ত্রৈগুণ্যময়ী শক্তির লীলা দেখা ইহার সর্ব্ব-প্রথম উপক্রম। ইহা বুঝিয়া সাত্ত্বিক কর্ত্তা কর্ত্তৃত্ব-অভিমান ত্যাগে ভগবানে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণপূর্ব্বক কর্ম্ম করেন।

গুণত্রয় ও গুণাতীত্য সম্বন্ধে যাহা বলিলাম, তাহা গীতার মূল কথা। কিন্তু এই শিক্ষা সাধারণতঃ গৃহীত হয় নাই, আজ পর্য্যন্ত যাহাকে আমরা আর্য্যশিক্ষা বলি, তাহা প্রায় সাত্ত্বিক গুণের অনুশীলন। রজোগুণের আদর এই দেশে ক্ষত্রিয় জাতির লোপে লুপ্ত হইয়াছে। অথচ জাতীয় জীবনে রজঃশক্তিরও নিরতিশয় প্রয়োজন আছে। সেইজন্য গীতার দিকে লোকের মন আজকাল আকৃষ্ট হইয়াছে। গীতার শিক্ষা পুরাতন আর্য্যশিক্ষাকে ভিত্তি করিয়াও অতিক্রম করিয়াছে। গীতোক্ত ধর্ম্ম রজোগুণকে ভয় করে না, তাহাতে রজঃ-শক্তিকে সত্ত্বসেবায় নিযুক্ত করিবার পন্থা আছে, প্রবৃত্তিমার্গে মুক্তির উপায় প্রদর্শিত আছে। এই ধর্ম্ম অনুশীলনের জন্য জাতির মন কিরূপে প্রস্তুত হইতেছে, তাহা জেলেই প্রথম হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলাম। এখনও স্রোত নির্ম্মল হয় নাই, এখনও কলুষিত ও আবিল, কিন্তু অতিরিক্ত বেগ যখন অল্প প্রশমিত হইবে, তখন তাহার মধ্যে যে বিশুদ্ধ শক্তি লুক্কায়িত, তাহার নিখুঁত কার্য্য হইবে।

যাঁহারা আমার সঙ্গে বন্দী ও এক অভিযোগে অভিযুক্ত, তাঁহাদের মধ্যে অনেকে নির্দ্দোষী বলিয়া মুক্তি পাইয়াছেন, আর সকলে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত বলিয়া দণ্ডিত।[১] মানবসমাজে হত্যা হইতে গুরুতর অপরাধ হইতে পারে না। জাতীয় স্বার্থপ্রণোদিত হইয়া যে হত্যা করে, তাহার ব্যক্তিগত চরিত্র কলুষিত না হইতে পারে কিন্তু তাহাতে সামাজিক হিসাবে অপরাধের গুরুত্ব লাঘব হইল না। ইহাও স্বীকার করিতে হয় যে হত্যার ছায়া অন্তরাত্মায় পড়িলে মনে যেন রক্তের দাগ বসিয়া থাকে, ক্রূরতার সঞ্চার হয়। ক্রূরতা বর্ব্বরোচিত গুণ, মনুষ্য উন্নতির ক্রমবিকাশে যে সকল গুণ হইতে অল্পে অল্পে বর্জিত হইতেছে, সেই সকলের মধ্যে ক্রূরতা প্রধান। ইহা সম্পূর্ণ বর্জন করিতে পারিলে মানব-জাতির উন্নতির পথে একটি বিঘ্নকর কন্টক উন্মূলিত হইয়া যাইবে। আসামীর দোষ ধরিয়া লইলে[২] ইহাই বুঝিতে হইবে যে, ইহা রজঃশক্তির ক্ষণিক উদ্দাম উচ্ছৃঙ্খলতা মাত্র। তাহাদের মধ্যে এমন সাত্ত্বিক শক্তি নিহিত যে এই ক্ষণিক উচ্ছৃঙ্খলতার দ্বারা দেশের স্থায়ী অমঙ্গল সাধিত হইবার কোনও আশঙ্কা নাই

[১] কিন্তু মোকদ্দমা আপীলে বিচারাধীন। তাঁহাদের দোষের সম্বন্ধে কোন বিচার করা এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে।

[২] বিচারাধীন আসামীর দোষ ধরিয়া লওয়া অন্যায়, সেইজন্য এইমাত্র বলিয়া ক্ষান্ত হইলাম যে, যদি এই দোষ প্রমাণিত হয় তাহা হইলেও ইহাই বুঝিতে হইবে যে, ইহা রজঃশক্তির ক্ষণিক উদ্দাম উচ্ছৃঙ্খলতা মাত্র।

অন্তরের যে স্বাধীনতার কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি, আমার সঙ্গীগণের সে স্বাধীনতা স্বভাবসিদ্ধ গুণ। যে কয়েকদিন আমরা একসঙ্গে এক বৃহৎ দালানে রক্ষিত ছিলাম, আমি তাঁহাদের আচরণ ও মনের ভাব বিশেষ মনোযোগের সহিত লক্ষ্য করিয়াছি। দুইজন ভিন্ন কাহারও মুখে বা কথায় ভয়ের ছায়া পর্য্যন্ত দেখিতে পাই নাই। প্রায় সকলেই তরুণবয়স্ক, অনেকে অল্পবয়স্ক বালক, যে অপরাধে ধৃত সাব্যস্ত হইলে তাহার দণ্ড যেরূপ ভীষণ তাহাতে দৃঢ়-মতি পুরুষেরও বিচলিত হইবার কথা। আর ইঁহারা বিচারে খালাস হইবার আশাও বড় রাখিতেন না। বিশেষতঃ ম্যাজিষ্ট্রেটের কোর্টে সাক্ষী ও লেখাসাক্ষ্যের যেরূপ ভীষণ আয়োজন জমিতে লাগিল, তাহা দেখিয়া আইন-অনভিজ্ঞ ব্যক্তির মনে সহজেই ধারণা হয় যে, নির্দ্দোষীরও এই ফাঁদ হইতে নির্গমনের পথ নাই। অথচ তাঁহাদের মুখে ভীতি বা বিষণ্ণতার পরিবর্ত্তে কেবল প্রফুল্লতা, সরল হাস্য, নিজের বিপদকে ভুলিয়া ধর্ম্মের ও দেশের কথা। আমাদের ওয়ার্ডে প্রত্যেকের নিকটে দুই-চারিখানি বই থাকায় একটি ক্ষুদ্র লাইব্রেরী জমিয়াছিল। এই লাইব্রেরীর অধিকাংশই ধর্ম্মের বই, গীতা, উপনিষদ, বিবেকানন্দের পুস্তকাবলী, রামকৃষ্ণের কথামৃত ও জীবনচরিত, পুরাণ, স্তবমালা, ব্রহ্মসঙ্গীত ইত্যাদি। অন্য পুস্তকের মধ্যে বঙ্কিমের গ্রন্থাবলী, স্বদেশীগানের অনেক বই, আর য়ুরোপীয় দর্শন, ইতিহাস ও সাহিত্যবিষয়ক অল্পস্বল্প পুস্তক। সকালে কেহ কেহ সাধনা করিতে বসিত, কেহ কেহ বই পড়িত, কেহ কেহ আস্তে গল্প করিত। সকালের এই শান্তিময় নীরবতায় মাঝে মাঝে হাসির লহরীও উঠিত। "কাচেরী" না থাকিলে কেহ কেহ ঘুমাইত, কেহ কেহ খেলা করিত—যে দিন যে খেলা জোটে, আসক্তি কাহারও নাই। কোন দিন মণ্ডলে বসিয়া কোন শান্ত খেলা—কোন দিন বা দৌড়াদৌড়ি লাফালাফি, দিন কতক ফুটবল চলিল, ফুটবলটা অবশ্য অপূর্ব্ব উপকরণে গঠিত। দিন কতক কানামাছিই চলিল; এক একদিন ভিন্ন ভিন্ন দল গঠন করিয়া একদিকে জুজুৎসু শিক্ষা অন্য দিকে উচ্চ লম্ফ ও দীর্ঘ লম্ফ আর একদিকে drafts বা দশপঁচিশ। দুই চারিজন গম্ভীর প্রৌঢ় লোক ভিন্ন সকলেই প্রায় বালকদের অনুরোধে এই সকল খেলায় যোগ দিতেন। দেখিলাম ইহাদের মধ্যে বয়স্ক লোকেরও বালস্বভাব। সন্ধ্যাবেলায় গানের মজলিস জমিত। উল্লাস, শচীন্দ্র, হেমদাস, যাহারা গানে সিদ্ধ, তাহাদের চারিদিকে আমরা সকলে বসিয়া গান শুনিতাম। স্বদেশী বা ধর্ম্মের গান ব্যতীত অন্য কোনরূপ গান হইত না। এক একদিন কেবল আমোদ করিবার ইচ্ছায় উল্লাসকর হাসির গান, অভিনয়, ventriloquism অনুকরণ বা গেঁজেলের গল্প করিয়া সন্ধ্যা কাটাইত। উল্লাসকরের ন্যায় অদ্ভুত ক্ষমতাশালী ও অপূর্ব্বচরিত্র লোক আমি আর কখনও দেখি নাই। শুনিয়াছিলাম বটে এমন লোক মাঝে মাঝে জন্মায় যাহার অন্তরাত্মায় মায়ার প্রভাব এত শিথিল যে সামান্য দেহের ধর্ম্ম ব্যতীত তাহার অন্য কোন বন্ধন নাই। "লিপ্যতে ন স পাপেন পদ্ম-পাত্রমিবাম্ভসা।" এই উক্তির যাথার্থ্য ও প্রকৃত মর্ম এবার উল্লাসকরের আচরণে

প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করিলাম। সামান্য মানুষের ন্যায় কর্ম্ম করেন, হাসেন, গল্প করেন, খেলেন, ভুল করেন, ন্যায় করেন, অন্যায় করেন, অথচ ভিতরে সেই নির্ম্মল দেবভাব। গায় হাজার কাদা পড়িলেও তাহা গায় লাগিয়া থাকে না। আমাদের রাগ সুখ দুঃখ ভয় স্বার্থ হিংসা দ্বেষ তাঁহার জন্যে সৃষ্ট হয় নাই। তাঁহার আছে প্রেম, আনন্দ, হাস্য, পরোপকার, পরসেবা, ফুলের স্বভাবসিদ্ধ স্বচ্ছতা ও প্রফুল্লতা। উল্লাসকর এই প্রকৃতিবিশিষ্ট লোক। তাঁহার মধ্যে আমি কখনও লেশমাত্র ক্রোধ, দুঃখ, দৈন্য, বিকার, বিষন্নতা দেখি নাই। কিছুতেই আসক্তি নাই। তাঁহার নিকট যে যাহা চাহিত তাহা তাহাকে বিলাইয়া দিতেন, নিজের যেন কিছুই নহে। কোন ভাবেও তিনি বদ্ধ নন। এইমাত্র সকলের মনোরঞ্জনার্থ হাসি তামাসা করিতেছিলেন। পরমুহূর্তে দেখিলাম হঠাৎ ধ্যানমগ্ন হইয়া সব ভুলিয়া গিয়াছেন। কেহ ধ্যানভঙ্গ করিলেও তাঁহার আসে যায় না। হাসিমুখে তাহার আবদার সহ্য করিতেন। সবই তাঁহার পক্ষে লীলা, যেমন সংসার, তেমনই জেল, যেমন নিবৃত্তি তেমনই প্রবৃত্তি। ভেদ নাই। বিকার নাই। এতদূর সাত্ত্বিক স্বাধীন ভাব অন্যসকলের মধ্যে না থাকিলেও প্রায় সকলেরই মধ্যে অল্পবিস্তর ছিল। মোকদ্দমায় কেহ মন দিত না, সকলেই ধর্ম্মে বা আনন্দে দিন কাটাইত। এই নিশ্চিন্ত ভাব কঠিন কুক্রিয়াভ্যস্ত হৃদয়ের পক্ষে অসম্ভব; তাহাদের মধ্যে কাঠিন্য, ক্রূরতা, কুক্রিয়াসক্তি, কুটিলতা লেশমাত্র ছিল না। কি হাস্য কি কথা কি খেলা তাহাদের সকলই আনন্দময়, পাপহীন, প্রেমময়।

এই মানসিক স্বাধীনতার ফল অচিরে বিকাশপ্রাপ্ত হইতে লাগিল। এইরূপ ক্ষেত্রেই ধর্ম্মবীজ বপন হইলে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ফল সম্ভবে। যীশু কয়েকজন বালককে দেখাইয়া শিষ্যদিগকে বলিয়াছিলেন, "যাঁহারা এই বালকদের তুল্য, তাঁহারাই ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হন।" জ্ঞান ও আনন্দ সত্ত্বগুণের লক্ষণ। যাঁহারা দুঃখকে দুঃখ জ্ঞান করেন না, যাঁহারা সকল অবস্থায় আনন্দিত প্রফুল্লিত, তাঁহাদেরই যোগে অধিকার। জেলে রাজসিক ভাব প্রশ্রয় পায় না, আর নির্জন কারাগারে প্রবৃত্তির পরিপোষক কিছুই নাই। এই অবস্থায় অসুরের মন চিরাভ্যস্ত রজঃশক্তির উপকরণের অভাবে আহত ব্যাঘ্রের ন্যায় নিজেকে নাশ করে। পাশ্চাত্য কবিগণ যাহাকে eating one's own heart বলেন, সেই অবস্থা ঘটে। ভারতবাসীর মন সেই নির্জনতায়, সেই বাহ্যিক কষ্টের মধ্যে চিরন্তন টানে আকৃষ্ট হইয়া ভগবানের নিকট ছুটিয়া যায়। আমাদের ইহাই ঘটিয়াছে। জানি না কোথা হইতে একটি স্রোত আসিয়া সকলকে ভাসাইয়া নিয়া গেল। যে কখনও ভগবানের নাম করে নাই, সেও সাধনা করিতে শিখিল। আর সেই পরম দয়ালুর দয়া অনুভব করিয়া আনন্দমগ্ন হইয়া পড়িল। অনেক দিনের অভ্যাসে যোগীর যাহা হয়, এই বালকদের দু'চারি মাসের সাধনায় তাহা হইয়া গেল। রামকৃষ্ণ পরমহংস একবার বলিয়াছিলেন, "এখন তোমরা কি দেখ্ছ––ইহা কিছুই নয়, দেশে এমন স্রোত আসছে যে, অল্প বয়সের ছেলে তিন দিন সাধনা করে' সিদ্ধি পাবে।" এই বালকদিগকে দেখিলে তাঁহার

ভবিষ্যদ্বাণীর সফলতা সম্বন্ধে সন্দেহ মাত্র থাকে না। ইহারা যেন সেই প্রত্যাশিত ধর্ম্মপ্রবাহের মূর্ত্তিমন্ত পূর্ব্বপরিচয়; এই সাত্ত্বিকভাবের তরঙ্গ কাঠগড়া বহিয়া চারপাঁচজন ভিন্ন অন্য সকলের হৃদয় মহানন্দে আপ্লুত করিয়া তুলিত। ইহার আস্বাদ যে একবার পাইয়াছে সে কখনও তাহা ভুলিতে পারে না এবং কখনও অন্য আনন্দকে ইহার তুল্য বলিয়া স্বীকার করিতে পারে না। এই সাত্ত্বিকভাবই দেশের উন্নতির আশা। ভ্রাতৃভাব, আত্মজ্ঞান, ভগবৎপ্রেম যেমন সহজে ভারতবাসীর মনকে অধিকার করিয়া কার্য্যে প্রকাশ পায়, আর কোনও জাতির তেমন সহজে হওয়া সম্ভব নয়। চাই তমোবর্জন, রজোদমন, সত্ত্বপ্রকাশ। ভারতবর্ষের জন্য ভগবানের গূঢ় অভিসন্ধিতে তাহাই প্রস্তুত হইতেছে।

নবজন্ম

গীতায় অর্জুন শ্রীকৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "যাঁহারা যোগপথে প্রবেশ করিয়া শেষ পর্য্যন্ত যাইতে না যাইতে স্খলিতপদ ও যোগভ্রষ্ট হন, তাঁহাদের কি গতি হয়? তাঁহারা কি ঐহিক ও পারত্রিক উভয় ফলে বঞ্চিত হইয়া বায়ুখণ্ডিত মেঘের মত বিনষ্ট হন?" উত্তরে শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, "ইহলোকে বা পরলোকে সেইরূপ ব্যক্তির বিনাশ অসম্ভব। কল্যাণকৃৎ কখনও দুর্গতিপ্রাপ্ত হন না। পুণ্যলোকসকলে তাঁহার গতি হয়, সেখানে অনেককাল বাস করিয়া শুদ্ধ শ্রীমান্ পুরুষদের গৃহে অথবা যোগযুক্ত মহাপুরুষদের কুলে দুর্লভ জন্ম হয়, সেই জন্মে পূর্ব্বজন্মপ্রাপ্ত যোগলিপ্সাচালিত হইয়া সিদ্ধির জন্য আরও চেষ্টা করেন, শেষে অনেক জন্মের অভ্যাসে পাপমুক্ত হইয়া পরম-গতি লাভ করেন।" যে পূর্ব্বজন্মবাদ চিরকাল আর্য্যধর্ম্মের যোগলব্ধ জ্ঞানের অঙ্গবিশেষ, পাশ্চাত্য বিদ্যার প্রভাবে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে তাহার প্রতিপত্তি বিনষ্টপ্রায় হইয়াছিল, শ্রীরামকৃষ্ণ-লীলার পরে বেদান্তশিক্ষাপ্রচারে ও গীতার অধ্যয়নে সেই সত্য পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইতেছে। স্থূলজগতে যেমন heredity প্রধান সত্য, সূক্ষ্মজগতে তেমনই পূর্ব্বজন্মবাদ প্রধান সত্য। শ্রীকৃষ্ণের উক্তিতে দুইটি সত্য নিহিত আছে। যোগভ্রষ্ট পুরুষ তাঁহার পূর্ব্বজন্মার্জিত জ্ঞানের সংস্কারের সহিত জন্মগ্রহণ করেন, সেই সংস্কার দ্বারা বায়ুচালিত তরণীর ন্যায় যোগপথে চালিত হন। কিন্তু কর্ম্মফলপ্রাপ্তির যোগ্য শরীর উৎপাদনার্থ উপযুক্ত কুলে জন্মলাভ প্রয়োজন। উৎকৃষ্ট heredity যোগ্যশরীরের উৎপাদক। শুদ্ধ শ্রীমান্ পুরুষের গৃহে জন্ম হইলে শুদ্ধ সবল শরীর উৎপাদন সম্ভব, যোগীকুলে জন্মগ্রহণে উৎকৃষ্ট মন ও প্রাণ গঠিত হয় এবং সেইরূপ শিক্ষা ও মানসিক গতিলাভও হয়।

ভারতবর্ষে কয়েক বৎসর ধরিয়া দেখা যাইতেছে যেন একটি নূতন জাতি পুরাতন তমঃ-অভিভূত জাতির মধ্যে সৃষ্ট হইতেছে। ভারতমাতার পুরাতন সন্ততি ধর্ম্মগ্লানি ও অধর্ম্মের মধ্যে জন্মগ্রহণ করিয়া ও সেইরূপ শিক্ষালাভ করিয়া অল্পায়ু, ক্ষুদ্রাশয়, স্বার্থপরায়ণ, সঙ্কীর্ণহৃদয় হইয়াছিল। তাহাদের মধ্যে অনেক তেজস্বী মহাত্মা দেহপ্রাপ্ত হইয়া এই বিষম বিপৎকালে জাতিকে রক্ষা করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহারা তাঁহাদের শক্তি ও প্রতিভার উপযুক্ত কর্ম্ম না করিয়া কেবল জাতির ভবিষ্যৎ মাহাত্ম্য ও বিশাল কর্ম্মের ক্ষেত্র সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদেরই পুণ্যবলে নব ঊষার কিরণমালা চারিদিক উদ্ভাসিত করিতেছে। ভারতজননীর নূতন সন্ততি পিতামাতার গুণপ্রাপ্ত না হইয়া

সাহসী, তেজস্বী, উচ্চাশয়, উদার, স্বার্থত্যাগী, পরার্থে ও দেশহিতসাধনে উৎসাহী ও উচ্চাকাঙক্ষাপূর্ণ হইয়াছে। এইজন্য আজকাল পিতামাতার বশ না হইয়া যুবকগণ স্বপথে পথিক হইতেছে, বৃদ্ধে-তরুণে মতের অনৈক্য ও কার্য্যকালে বিরোধ উপস্থিত হইতেছে। বৃদ্ধগণ এই দেবাংশসম্ভূত তরুণ সত্যযুগ-প্রবর্ত্তকগণকে স্বার্থ ও সঙ্কীর্ণতার সীমায় আবদ্ধ রাখিতে চাহিতেছেন, না বুঝিয়া কলির সাহায্য করিতেছেন। যুবকগণ মহাশক্তিসৃষ্ট অগ্নিস্ফুলিঙ্গ, পুরাতন ভাঙ্গিয়া নূতন গড়িতে উদ্যত, তাঁহারা পিতৃভক্তি ও বাধ্যতা রক্ষা করিতে অক্ষম। এই অনর্থের উপশম ভগবানই করিতে পারেন। তবে মহাশক্তির ইচ্ছা বিফল হইতে পারে না, এই নবীন সন্ততি যাহা করিতে আসিয়াছেন, তাহা সুসম্পন্ন না করিয়া যাইবেন না। এই নূতনের মধ্যেও পুরাতনের প্রভাব আছে। অপকৃষ্ট heredity-র দোষে আসুরিক শিক্ষার দোষে অনেক কুলাঙ্গারও জন্মগ্রহণ করিয়াছে; যাহারা নবযুগ-প্রবর্ত্তনে আদিষ্ট তাঁহারাও অন্তনিহিত তেজ ও শক্তি বিকাশ করিতে পারিতেছেন না। নবীনদিগের মধ্যে সত্যযুগ প্রকাশের একটি পূর্ব্বলক্ষণ, ধর্ম্মে মতি ও অনেকের হৃদয়ে যোগলিপ্সা ও অর্দ্ধবিকশিত যোগশক্তি।

আলিপুর বোমার মোকদ্দমায় অভিযুক্ত অশোক নন্দী শেষোক্ত শ্রেণীর মধ্যে একজন। বলা হইয়াছে, যাঁহারা তাঁহাকে চিনিতেন তাঁহারা কেহ বিশ্বাস করিতে পারিতেন না যে, ইনি কোনও ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইয়াছিলেন। ইনি অল্প ও অবিশ্বাসযোগ্য প্রমাণে দণ্ডিত হইয়াছিলেন। তিনি অন্য যুবকগণের ন্যায় প্রবল দেশসেবার আকাঙক্ষায় অভিভূত হন নাই। বুদ্ধিতে, চরিত্রে, প্রাণে তিনি সম্পূর্ণ যোগী ও ভক্ত, সংসারীর গুণ তাঁহার মধ্যে ছিল না। তাঁহার পিতামহ সিদ্ধ তান্ত্রিক যোগী ছিলেন, তাঁহার পিতাও যোগপ্রাপ্ত শক্তিবিশিষ্ট পুরুষ। গীতায় যে যোগীকুলে জন্ম মানুষের পক্ষে অতি দুর্লভ বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে, তাঁহার ভাগ্যে তাহাই ঘটিয়াছিল। অল্পবয়সে তাঁহার অন্তর্নিহিত যোগশক্তির লক্ষণ এক-একবার প্রকাশ পাইয়াছে। ধৃত হইবার বহু পূর্ব্বে তিনি জানিতে পারিয়াছিলেন যে, তাঁহার যৌবনকালে মৃত্যু নিদ্দিষ্ট, অতএব বিদ্যালাভে ও সাংসারিকজীবনের পূর্ব্ব আয়োজনে তাঁহার মন বসে নাই, তথাপি পিতার পরামর্শে পূর্ব্বজ্ঞাত অসিদ্ধি উপেক্ষা করিয়া কর্ত্তব্য কর্ম্ম বলিয়া তাহাই করিতেছিলেন এবং যোগপথেও আরূঢ় হইয়াছিলেন। এমন সময়ে তিনি অকস্মাৎ বিনা কারণে ধৃত হইলেন। এই কর্ম্মফলপ্রাপ্ত বিপদে বিচলিত না হইয়া অশোক জেলে যোগাভ্যাসে সম্পূর্ণ শক্তি প্রয়োগ করিতে লাগিলেন। এই মোকদ্দমায় আসামীদের মধ্যে অনেকে এই পথ অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে তিনি অগ্রগণ্য না হইলেও অন্যতম ছিলেন। তিনি ভক্তি ও প্রেমে কাহারও অপেক্ষা হীন ছিলেন না। তাঁহার উদার চরিত্র, গম্ভীর ভক্তি ও প্রেমপূর্ণ হৃদয় সকলের পক্ষে মুগ্ধকর ছিল। গোঁসাই-এর হত্যার সময়ে তিনি হাসপাতালে রুগ্ন অবস্থায় ছিলেন। সম্পূর্ণ স্বাস্থ্যলাভের পূর্ব্বেই নির্জন

কারাবাসে রক্ষিত হইয়া তিনি বার বার জ্বরভোগ করিতে লাগিলেন। সেই জ্বরাবস্থাতেই মুক্তকক্ষে হিমে রাত্রি যাপন করিতে হইত। ইহাতে ক্ষয়রোগ প্রাপ্ত হইয়া সেই অবস্থায়, যখন প্রাণরক্ষার আর আশা নাই, তখন বিষম দণ্ডে দণ্ডিত হইয়া তিনি আবার সেই মৃত্যু-আগারে রক্ষিত ছিলেন। ব্যারিষ্টার চিত্তরঞ্জন দাশের আবেদনে তাঁহাকে হাসপাতালে লইবার ব্যবস্থা করা হইল, কিন্তু জামিনে মুক্তিদান করা হইল না। শেষে ছোটলাটের সহৃদয়তায় তিনি স্বগৃহে স্বজনের সেবা পাইয়া মরিবার অনুমতি পাইলেন। আপীলে মুক্ত হইবার পূর্ব্বেই ভগবান তাঁহাকে দেহকারাবাস হইতে মুক্তি দিলেন। শেষকালে অশোকের যোগশক্তি বিলক্ষণ বৃদ্ধি পায়, মৃত্যুর দিন বিষ্ণুশক্তিতে অভিভূত হইয়া সকলকে ভগবানের মুক্তিদায়ক নাম ও উপদেশ বিতরণ করিয়া নামোচ্চারণ করিতে করিতে তিনি দেহত্যাগ করিলেন। পূর্ব্বজন্মার্জিত দুঃখ-ফল ক্ষয় করিতে অশোক নন্দীর জন্ম হইয়াছিল, সেইজন্য এই অনর্থক কষ্ট ও অকাল মৃত্যু ঘটিয়াছে। সত্যযুগ-প্রবর্ত্তনে যে-শক্তির প্রয়োজন সেই শক্তি তাঁহার শরীরে অবতীর্ণ হয় নাই, কিন্তু তিনি স্বাভাবিক যোগশক্তি প্রকাশের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত দেখাইয়া গিয়াছেন। কর্ম্মের গতি এইরূপই হয়। পুণ্যবান পাপফল ক্ষয় করিতে অল্পকাল পৃথিবীতে বিচরণ করেন, পরে পাপমুক্ত হইয়া দুষ্টদেহ ত্যাগ ও অন্যদেহ গ্রহণপূর্ব্বক অন্তর্নিহিত শক্তি প্রকাশ ও জীবের হিতসম্পাদন করিতে আসেন।